Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

পঞ্চম বর্ষ ■ সংখ্যা ১ - জুন ২০১৫

নেপালের বিধ্বংসী ভূমিকম্প – কতগুলি প্রশ্ন ও তার ব্যাখ্যা

গোমূত্র এবং গোবর কি সর্বরোগহরা?

মানুষের চোখে আকাশের রঙ কী এবং কেন?

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

সম্পাদকীয় ঃ	বিশ্বজুড়ে যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের উপর মৌলবাদী হামলার শেষ কোথায়?	৩
সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ঃ	বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে নানা বিতর্ক এবং তার সারসংক্ষেপ	৪
চিঠিপত্র ঃ		৮
নিবন্ধ ঃ	নেপালের বিধ্বংসী ভূমিকম্প – কতগুলি প্রশ্ন ও তার ব্যাখ্যা	১১
সমাজ দর্পণ ঃ	গোমূত্র এবং গোবর কি সর্বরোগহরা?	২১
	ম্যাগি বিতর্ক এবং তারপর...	২৬
	মুনাফা নয়, জনস্বার্থে চালিত হোক পরিবেশ ভাবনা	২৭
জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান ঃ	মানুষের চোখে আকাশের রঙ কী এবং কেন?	২৯
অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট ঃ	পোকার আক্রমণে কুলতলীর কৃষকরা সর্বস্বান্ত	৩৩
রিপোর্ট ঃ	বনগাঁয় মৌলবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা	৩৭
বিজ্ঞানের খবর ঃ		৩৯
সংগঠন সংবাদ ঃ	দার্জিলিঙ জেলার ফাঁসীদেওয়ায় বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মসূচী এবং বিডিও'র সাক্ষাৎকার	৪২
	২০১৫'র বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন	৪৪
বিজ্ঞানীদের আন্দোলন ঃ	ইউরোপের বিজ্ঞানীরা আন্দোলনে	৪৮

সম্পাদকীয়

বিশ্বজুড়ে যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের উপর মৌলবাদী হামলার শেষ কোথায়?

" ... তা হলে কি নিয়ে লিখব আমি। কেউ কি বলতে পারবেন কি নিয়ে লিখলে সরকার, রাজনৈতিক দল, মৌলবাদী, জনগণ, স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ সব গোষ্ঠী শান্ত থাকবে? আছেন কি কেউ বুদ্ধি দেওয়ার মতো? হ্যালো ... ।" এটা হলা বাংলাদেশী ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান বাবু'র নিজস্ব ব্লগে শেষলেখার শেষ কয়েকটি পঙক্তি। ব্লগে এই লেখা প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন পর ৩০শে মার্চ ২০১৫ ওয়াশিকুরকে ঢাকার প্রকাশ্য রাজপথে দিবালোকে চপার দিয়ে খুন করে মৌলবাদীরা। এই ঘটনার পাঁচ সপ্তাহ আগে 'মুক্তমনা' ব্লগের কর্ণধার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অভিজিত রায়কে তাঁর জন্মভূমি ঢাকার বইমেলা চত্তরে একইভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়। তাঁর স্ত্রীকেও আক্রমণ করতে ছাড়েনি মৌলবাদীরা। এর কিছুদিন পর বাংলাদেশের শ্রীহট্ট নিবাসী লেখক ও ব্লগার অনন্ত বিজয় দাসকেও মৌলবাদীরা হত্যা করেছে কুসংস্কার ও অন্ধ মৌলবাদী নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্য। ২০১৩ সালে আহমেদ রাজীব হায়দারকেও প্রায় এই কারণে খুন করা হয়েছিল। ২০০৪ সালে বাংলাদেশী লেখক ও শিক্ষক হুমায়ুন আজাদকেও হত্যা করার প্রয়াস নিয়েছিল মৌলবাদীরা।

গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে একের পর এক যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের উপর ইসলামি মৌলবাদীদের নৃশংস হামলার জন্য এদেশের অনেক তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের বলতে শোনা যাচ্ছে যে ইসলামি মৌলবাদী এবং ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীরাই মানবতার শত্রু। কিন্তু বাস্তবটা এমন কী? হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকবাবে চড়া সুরে বক্তব্য রাখার জন্য মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে এবছর ফেব্রুয়ারিতেই খুন করা হয়েছে গোবিন্দ পানেসরকে। ২০১৩ সালের অগাস্টে মহারাষ্ট্রের পুণেতে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের জন্য হিন্দু মৌলবাদীরা নরেন্দ্র দাভোলকরকে গুলি করে হত্যা করেছিল। এমন ঘটনা ঘটছে পাকিস্তানে, এমন ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, মায়ানমারে, ইসরাইলে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, ইউরোপ আমেরিকাসহ দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র।

এগুলি কি নতুন ঘটনা? শুধু কি যুক্তিবাদী / বিজ্ঞান মনস্ক মানুষেরাই মৌলবাদের শিকার? তা নয়। আজ দুনিয়ার সর্বত্র ধর্ম / সম্প্রদায় / বর্ণ / জাতির নামে অন্ধ মৌলবাদীরা নৃশংস হামলা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের উপর। এদের দ্বারাই আবার বহুক্ষেত্রে মহিলারা ধর্ষিতা হচ্ছেন।

ইতিহাস ঘাঁটলেই আমরা দেখতে পাই যে দাসযুগ এবং সামন্তযুগে রাজার শাসন এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠানের শোষণ-নিপীড়ণ এবং অন্ধ অলৌকিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার অধিকার কারও ছিল না। অলৌকিকতত্বের বিরুদ্ধে আপোষহীন প্রতিবাদ করায় জিওদার্নো ব্রুণোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়, কারাগারের অন্ধকারে বাস করতে হয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে। ধর্ম এবং সমাজের সংস্কারকরাও রেহাই পান নি। পুঁজিবাদের সূচনাকালে বুর্জোয়াশ্রেণী বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরলেও একচেটিয়া যুগে এসে শাসন শোষণ টিঁকিয়ে রাখতে প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যবোধগুলিকে নতুন মোড়কে সাজিয়ে তুলছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নায়াগ্রার সম্মেলনে জন্ম হয় খ্রীষ্টীয় মৌলবাদের। বলা হয় প্রাচীন বাইবেলের কাহিনীর বিরোধিতা করবে যারা, রেহাই পারে না তারা। এরপর একে একে জন্ম দেওয়া হয় ইসলাম, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ... মৌলবাদের। কোন একটা বিশ্বাসকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে তার বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি, বিশ্বাস এবং বৈজ্ঞানিক চেতনাকে দমন করাই মৌলবাদী আগ্রাসন। প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিশক্তিকে দমন করতে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা গড়ে তুলছে, লালন পালন করছে মৌলবাদকে। মাঝে মধ্যে এরাই আবার বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে তাদের দিকে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে টিঁকিয়ে রাখতে, শোষিত মানুষের সংগ্রামকে বিপথে চালাতে ধর্মীয় মৌলবাদীদের নৃশংস হামলায় দেশে দেশে শাসকশ্রেণী নীরব দর্শকের ভূমিকায়। শ্রেণী শোষণমূলক ব্যবস্থা জারি থাকবে আর মৌলবাদের অবসান হবে, যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রসার হবে এই ভাবনা তাই বাস্তব নয়, অলীক কল্পনা মাত্র। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবসানই পারে অন্ধত্ব থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে, প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার অবসান ঘটাতে। মৌলবাদী আগ্রাসনের অবসান এবং বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারের অন্য কোন পথ নেই। ওয়াশিকুর রহমানের শেষ প্রশ্নের জবাব এখানেই লুকিয়ে আছে। ■

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে নানা বিতর্ক এবং তার সারসংক্ষেপ

পরিচিত-অপরিচিত, নতুন-পুরানো সকল পাঠক ও সমালোচকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায়, সমাজে বহুল প্রচারিত, "বিশ্ব উষ্ণায়ন মনুষ্য সৃষ্ট" বক্তব্যের একপেশে অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা যুক্তির বিপরীতে, 'বিজ্ঞান মনস্ক' তার মুখপত্র 'সমীক্ষণ' পত্রিকার মাধ্যমে প্রায় ধারাবাহিকভাবে তিন বছর যাবৎ, "বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি প্রাকৃতিক ঘটনা"র পক্ষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যুক্তি পেশ করেছে।

সমীক্ষণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, "পরিবেশ ভাবনার স্বরূপ ও সমাধান" শীর্ষক রচনায় প্রথম উল্লেখ করা হয়, 'বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি প্রাকৃতিক ঘটনা" এবং ফসিল ফুয়েল ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণের তথা কার্বন নির্গমন হ্রাস করার বিষয়টিকে সামনে রেখে, "কার্বন বাণিজ্যের" সূচনার কথা উল্লেখ করা হয়।

প্রথম বছর চতুর্থ সংখ্যায়, "গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি মানুষের সৃষ্টি" শীর্ষক রচনায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় – বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রথম ও প্রধান কারণ হলো মহাজাগতিক। যখন থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠ ও বায়ুমন্ডলের তাপের উৎস হয় সূর্য, সেই সময় থেকে পৃথিবী ও সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থানের পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তির জন্য পৃথিবী পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল হয়েছে। পৃথিবীর বুকে পর্যায় ক্রমে তুষার যুগের আগমন ও অপসারণের ঐতিহাসিক প্রমাণ ভূবিজ্ঞানের অধিনস্ত যা হলো বিশ্ব উষ্ণায়নের মহাজাগতিক কারণের প্রত্যক্ষ ফলাফল – মিলানকোভিচ চক্রের বাস্তব প্রমাণ। বিশ্ব উষ্ণায়নের আনুসঙ্গিক কারণ, "গ্রীন হাউস এফেক্ট" – এর জন্য দায়ী করা কার্বন ডাই অক্সাইড এর পরিমাণ ভোস্তক-এর আর্ন্টাকটিকার আইস কোর ডাটা থেকে প্রায় ১,৪০,০০০-১,২০,০০০ বছর পূর্বের পাওয়া কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ছিল বর্তমানের অনুরূপ। যা মানব সভ্যতায় ফসিল-ফুয়েল ব্যবহারের বহু পূর্বের ঘটনা। এছাড়া বলা হয়েছে যে, সকল বৈজ্ঞানিক এই বিষয়ে সহমত যে গ্রীন হাউস এফেক্ট না থাকলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই রচনাটিতে আই পি সি সি'র প্রচারিত, "কার্বন ডাই অক্সাইড ভূত" এর জন্য পিন্ড দান করা হলেও, গ্রীন হাউস এফেক্টে'র জন্য প্রাকৃতিকভাবে ও প্রধানভাবে যে জলীয় বাষ্পই দায়ী সে ব্যাখ্যা দুর্বল ছিল। এই রচনায় দেখানো হয়েছিল মিলানকোভিচ চক্র, সৌরকলঙ্ক, গ্রীন হাউস গ্যাস-এর লব্ধি ফলাফল হলো "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" বা "গ্লোবাল কুলিং"। পৃথিবীর বুকে প্রাকৃতিকভাবে পর্যায়ক্রমে এই দুইয়ের আবির্ভাবের উদাহরণ হলো পর্যায়ক্রমিকভাবে বহু প্রজাতির উৎপত্তি ও অবলুপ্তির ঘটনা। এই রচনাতেই আই পি সি সি'র অসাড় বক্তব্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়। আই পি সি সি'র এইরূপ বক্তব্য প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুঁজিপতি শ্রেণীর বাজারের স্বার্থ রক্ষা করার বিষয়টি সঠিকভাবে উঠে এলেও তা একমাত্র উদ্দেশ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আই পি সি সি তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যটি প্রকাশিত না হয়ে চাপা পড়ে গেছে। তা এই রচনার শেষাংশে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমীক্ষণের দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায়, পাঠকের কলমে, সরশুনা হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রী চঞ্চল রায়ের চিঠিতে, পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিশ্ব উষ্ণায়ন কি মানুষের সৃষ্টি?' সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় -

"বলতে দ্বিধা নেই এই লেখা আমার মতো অনেকের গ্লোবাল ওয়ার্মিং সংক্রান্ত ভুল ধারণাগুলিকে মেটাতে সমর্থ হয়েছে।... শুধু একটি বিষয় বলার আছে। আমার মনে হয়েছে লেখাটি কোথাও কি প্রথম বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির অবিবেচক, অনিয়ন্ত্রিত এবং ইচ্ছাকৃত পরিবেশের ক্ষতি করাকে সমর্থন করছে না?"

এই পত্রের জবাবে সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে বলা হয়, – "আপনার পত্র, আমাদের সঠিকভাবে ধরিয়ে দিয়েছে যে, এই রচনাটিকে হাতিয়ার ক'রে প্রথম বিশ্ব তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর ধারক-বাহকরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারে। এজন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।

ইচ্ছাকৃত তো দূরের কথা অনিচ্ছাকৃত ও শুধু শুধু পরিবেশের ক্ষতি করা (ভারসাম্য নষ্ট করা) কে আমরা সমর্থন করি না। তবে মানব স্বার্থে শিল্পের বিকাশকে আমরা সমর্থন করি, সেক্ষেত্রেও অবশ্যই দূষণ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে। তবে দূষণ নিয়ন্ত্রণের দূষণ যেন সমাজ প্রগতির অন্তরায় না হয়।"

সমীক্ষণের দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায়, 'তরুণ ভারত

ভাবনার' গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিষয়ক আলোচনা সভায়, "বিজ্ঞান মনস্ক"র উপস্থিতি ও আলোচিত বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়। এই সভায় প্রবীণ জিওলজিস্ট ডঃ অসিত রায় বলেন, "... পুঁজিবাদ পৃথিবীতে আসার আগেও পৃথিবী উত্তপ্ত হয়েছে। তাকে বলে ন্যাচারাল গ্লোবাল ওয়ার্মিং। আবার তা ধীরে ধীরে ঠান্ডাও হয়েছে। মানুষ আসার আগে পৃথিবী প্রাকৃতিক নিয়মে এভাবে ৮ বার গরম হয়েছে ও ঠান্ডা হয়েছে। শেষ এই রকম ঠান্ডা হওয়ার ঘটনা ঘটে ১৮৫০ সালে যাকে, 'মিনি আইস এজ' নামে আখ্যা দেওয়া যায়। ... বর্তমানে পৃথিবী যেভাবে উত্তপ্ত হচ্ছে তাতে মানুষের কার্যকলাপ ও শিল্প বিকাশ অনেকাংশে দায়ী। এটিকে বলা হয় অ্যানথ্রোপোজেনিক গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ যা কিনা মনুষ্য সৃষ্ট। ...

বিজ্ঞান মনস্ক থেকে ডঃ অসিত রায়কে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি যে বললেন ১৮৫০-এর শেষে, মিনি আইস এজের কথা, তার মানে আমরা বর্তমানে ন্যাচারাল ওয়ার্মিং-এর পর্যায় আছি। ডঃ রায় নিজেই বলেছেন যে 'ন্যাচারাল ওয়ার্মিং'-এর পর 'ন্যাচারাল কুলিং' হয়। তাই এই ওয়ার্মিং বা উষ্ণায়ন চিন্তার বিষয় নয়। কিন্তু পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন মনুষ্যসৃষ্ট কারণের কথা। তাহলে তিনি কি বলতে পারবেন যে মনুষ্যসৃষ্ট ওয়ার্মিং ন্যাচারাল ওয়ার্মিং-এর তুলনায় কতগুণ বেশি? যদি তা ন্যাচারাল ওয়ার্মিং-এর সামান্য কিছু অংশ হয় তবে তো তাকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, কারণ তা স্বাভাবিক নিয়মেই ন্যাচারাল কুলিং-এর মধ্য দিয়ে ব্যালেন্স করে যাবে। ডঃ রায় উঠে দাঁড়িয়ে জানান এবিষয়ে গবেষকদের এখনো পর্যন্ত সঠিক কোন তথ্য-প্রমাণ নেই। তবে আইপিসিসি'র বিরোধী বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অ্যানথ্রোপজেনিক ফ্যাক্টরটি নাকি নগণ্য। এছাড়া অ্যানথ্রোপজেনিক ওয়ার্মিং-এর ফলাফলের পূর্বাভাষ করার জন্য আইপিসিসি'র সেই সময়কার সভাপতি রাজেন্দ্র পাচৌরিকে নোবেল পাওয়ার পরও বহুভাবে সমালোচিত হতে হয়। ... মি. রায় আবার বক্তব্য রাখতে চান ১০ মিনিটের জন্য, সেখানে তিনি কার্বন বাণিজ্যে স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। তিনি দেখান যে মনুষ্যসৃষ্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং'কে কারণ হিসাবে খাড়া করে কিভাবে পুঁজিপতিরা কার্বন বাণিজ্যে মেতে উঠেছে।"

সমীক্ষণের তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, "আইপিসিসি নীরব কেন?" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই রচনায়, সে বছর ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন-এ ব্যাপক শীতলতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়, এটা বোঝাতে যে পরিবেশের উষ্ণতা প্রধানত প্রাকৃতিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই রচনায় উল্লেখ করা হয় –

১) "... বিজ্ঞানী মহলের এক অংশ দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছেন যে মনুষ্যজনিত ভূউষ্ণায়ন-এর অন্যতম রূপকার বিজ্ঞানীরা আসলে একটা রাজনৈতিক মতের পক্ষেই সওয়াল করেছেন। বিবিসি'র আবহাওয়া-বিষয়ক প্রতিনিধি পল হাডসন মজা করে বলেছেন, "ভূ-তাপমাত্রা সংক্রান্ত পূর্বাভাসগুলি ভূউষ্ণায়নের চেয়েও উত্তপ্ত।"

২) "... একদল কম্পিউটার হ্যাকার, বৃটিশ আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের পারস্পরিক আদান-প্রদান করা একগুচ্ছ ই-মেল সাধারণ মানুষের কাছে ফাঁস করে দেয়। ঐ ই-মেল পাঠ করে দেখা যায় বৃটিশ আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা কিভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিসংখ্যানগুলি অদলবদল করে দিয়ে মনুষ্যজনিত ভূ-উষ্ণায়নের তত্ত্বকে ধীরে ধীরে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছে এবং ঐ তত্ত্বের সমালোচকদের যুক্তিকে দাবিয়ে দিচ্ছে।"

৩) "রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের এক বক্তৃতায় ইন্সটিটিউট অফ জিওগ্রাফির প্রধান ভ্লাদিমির কোটলিয়াকভ বলেছেন, 'এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর তাপমাত্রা কেবল বৃদ্ধিই পেয়ে যাবে এমনটা মনে করার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। ভূশীতলায়নের প্রাথমিক লক্ষ্মণগুলি বেশি পরিষ্কার হচ্ছে এবং আগামী বছরগুলিতে তা আরো প্রকট হবে। তিনি আরও বলেন, মনুষ্য ক্রিয়াকলাপের এবং শিল্প ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণের প্রভাবে প্রকৃতির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ঠিকই তবে প্রকৃতির শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতিতে উষ্ণায়ণ ও শীতলায়ন পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়, আবার শুষ্কতা ও আর্দ্রতা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। এখেত্রে উল্লেখ করা হয় দরকার সৌর পদার্থ বিজ্ঞানীরাও ভূ-উষ্ণায়নের ব্যাপারে এমন ধারণাই পোষণ করেন।"

৪) "যে পুঁজিগোষ্ঠী উষ্ণায়নকে সামনে রেখে বিশ্ব বাজার সৃষ্টির খোয়াব দেখেছেন, শীতলায়ন হলে তারা যে ঘুমিয়ে থাকবেন এমন ভবনার কোন কারণ নেই। আই পি সি সি নীরব কেন? নীরবতা ভাঙ্গুন। নীরবতা বিজ্ঞানীদের শোভা পায় না।"

এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, "হিমালয়ের হিমবাহের গলন প্রসঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়নের তত্ত্ব খারিজ করলেন বিজ্ঞানীরা"। এই রচনাতে – উল্লেখ করা হয়, "ওয়াদিয়া ইন্সটিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজির ডাইরেক্টর ডঃ এ কে দুবে সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হিমবাহের গলনের জন্য বহু চর্চিত এবং তথাকথিত মনুষ্যজনিত কারণে বিশ্ব উষ্ণায়নের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন – 'হিমালয়ের হিমবাহগুলি যথেষ্ট নিরাপদ অবস্থানে

আছে এবং তার কোনও অস্বাভাবিক গলন হয়নি।' তিনি বলেন, 'হিমালয়ের হিমবাহগুলির আকার ও আয়তন আঞ্চলিক তুষাপাতের উপর নির্ভর করে, বাহ্যিক কারণ হিসাবে মনুষ্যজনিত উষ্ণায়নের উপর নয়। এ প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট মতামত দিতে গেলে অন্তত পক্ষে ৩০ বছরের ধারাবাহিক গবেষণার প্রয়োজন। বৃটিশ ওয়েদার অবজারভেটরি স্টাডিজ কর্তৃক বিগত ১৪০ বছরের বেশি সময় ধরে উত্তরাখন্ডের আলোমড়ার কাছে মুক্তেশ্বর গবেষণা কেন্দ্রে তাপমাত্রার হিসাবে দেখা গেছে এই সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ৪° সেলসিয়াস কমেছে।"

সমীক্ষণ পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যায়, পাঠকের কলমে, শ্রী পার্থ সারথী মুখার্জী প্রেরিত, "মনুষ্যজনিত কারণেই বিশ্ব উষ্ণায়ন" প্রকাশিত হয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যকে প্রচারিত অবৈজ্ঞানিক ও অধিবিদ্যক তত্ত্বের দ্বারা খন্ডন করতে, 'An interesting reading on Global warming' কলমে https/mail google.com ওবেসাইটে প্রকাশিত একটি রচনার সাহায্য নেন। তিনি উল্লেখ করেন, "২০০৭ সালে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্টস যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে সহমত হলো তখন আর কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থা থাকল না যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষকে দায়ী করছে না। এই বিষয় নিয়ে কাজ করছে এমন বিজ্ঞানীদের ৯০ শতাংশের বেশি এই বিষয়ে সহমত। ...

কিছু অজ্ঞ, গর্বোদ্ধত মানুষ দেখা যায়, যাদের কোনও বৈজ্ঞানিক হিসাবে ক্রেডেনশিয়াল নেই – বিপরীত মত পোষণ করেন। কিন্তু তারা কিছু বিক্ষিপ্তভাবে কর্মরত বিজ্ঞানীদের নিয়ে সমগ্র সমাজ, বিজ্ঞান মহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের মত পোষণ করে গর্ব অনুভব করে।"

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, এই রচনার শেষাংশে পার্থবাবুর পত্রের জবাব পেশ করা হবে।

সমীক্ষণ পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায়, পাঠকের কলমে, সংযুক্তা চক্রবর্তীর প্রেরিত, "৪ লক্ষ ২০ হাজার বছরের তথ্য প্রমাণ করে, বিশ্ব উষ্ণায়ন মনুষ্য সৃষ্ট নয়" প্রকাশিত হয়। যাতে গ্রীন হাউস এফেক্টের জন্য মানুষের ভূমিকা নগণ্য – যা বিশ্বউষ্ণায়ন ও শীতলায়নের জন্য তেমন কোনও প্রভাবই ফেলে না। তার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই রচনার শেষাংশে বলা হয়েছে যে বহু ক্রেডেনশিয়াল বিজ্ঞানী বিশ্ব উষ্ণায়ণ সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক মত প্রচার করে প্রচুর অর্থ কামিয়েছে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত কেরিয়ার তৈরী করেছে।

সমীক্ষণ পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় পাঠকের কলমে, এনথনি ওয়াসি'র "জলবায়ু পরিবর্তন, জলচক্রের দ্বারাই প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বারা নয়" প্রকাশিত হয়। এই রচনায় উল্লেখ করা হয়, "আইপিসিসি ও আজকালকার জলবায়ু মডেল প্রস্তুতকারী "মাছির তাড়াতে কুকুরের ছুটোছুটি"র মডেল প্রচার করছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মাছি হল কার্বন ডাই অক্সাইড এবং কুকুর হল জলচক্র। মনুষ্যজনিত উষ্ণায়নের প্রবক্তাদের মতে বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পের পজিটিভ ফিটব্যাক মনুষ্যজনিত কারণে নির্গত গ্রিন হাউস গ্যাস (কার্বন ডাই অক্সাইড)-এর জন্য হচ্ছে। এই রচনার মূল বক্তব্য হলো বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমুদ্র তথা জলচক্রের ভূমিকা কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় অনেক শক্তিশালী।

এই সংখ্যায়, "বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কি পরিবেশ নিষ্ক্রিয়?" শীর্ষক সোমদেব বাবুর রচনায় উল্লেখ করা হয় –

১) "ইতিমধ্যে ভূতাত্ত্বিকরা এটা প্রমাণ করেছেন যে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড অতিরিক্ত হয়ে গেলে পৃথিবীর বিশাল জলরাশি তার সক্রিয় প্রতিক্রিয়া দেখায়। অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা বিশাল অংশ জলে দ্রবীভূত হয়ে ধীরে ধীরে তা কার্বনেট লবনে পরিবর্তিত হয় ও সমুদ্রের তলদেশে অধঃক্ষিপ্তহয়। এই প্রক্রিয়া বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই গবেষণার ফলাফল পরিবেশের নিষ্ক্রিয়তার তত্ত্বকে খারিজ করেছে।"

এই রচনায় বিজ্ঞানীদের একাংশ দ্বারা প্রকাশিত যে মন্তব্য তুলে ধরা হয়, তা হল – "... ভূউষ্ণায়ন জনিত তথ্যগুলি ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত যে সমাধানগুলি বিশ্বজুড়ে পরিবেশন করা হচ্ছে তা যতটা না বৈজ্ঞানিক, তার থেকে বেশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।"

পার্থবাবুর চিঠি প্রসঙ্গে –

১) বিজ্ঞানের গবেষণা লব্ধ ফলাফলগুলি থেকে সিদ্ধান্তে পৌছাতে বিচার ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা কি কার্যকরী করা যায়? কোপারনিকাস, গ্যালিলিও থেকে শুরু করে নিউটন, আইনস্টাইন এবং বর্তমানের স্টিফেন হকিন্সরা আপনার প্রবর্তিত পথে – কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী ও তার অনুরূপ বিজ্ঞানী মহলের বিজ্ঞানীরা প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন করে বুর্জোয়াশ্রেণী স্বার্থের সিদ্ধান্তগুলিকে সকলের সিদ্ধান্তরূপে সমাজে

প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এই প্রসঙ্গে সমীক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি কি যথেষ্ট নয়?

২) জলবায়ু পরিবর্তনে, বিশ্বউষ্ণায়ন সৃষ্টিতে, গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধিতে, মানুষের ভূমিকা যে নগণ্য এবং তা প্রধানত প্রাকৃতিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয় তা সমীক্ষণে প্রকাশিত – "গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি মানুষের সৃষ্টি?", "তরুণ ভারত ভাবনা"র আলোচনা সভা, "৪ লক্ষ ২০ হাজার বছরের তথ্য প্রমাণ করে বিশ্ব উষ্ণায়ন মনুষ্য সৃষ্ট নয়", "জলবায়ুর পরিবর্তন – জলচক্রের দ্বারাই প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় – কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বারা নয়", "বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কি পরিবেশ নিষ্ক্রিয়?" ইত্যাদি রচনাগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে।

৩) পার্থবাবু, আপনার প্রেরিত রচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, "২০০৭ সালে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে সহমত হলো ... থাকল না যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষকে দায়ী করছে না।"

এখন প্রশ্ন হল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে কী? নাকি বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে প্রচারিত বক্তব্যের বিপক্ষে না থেকে অনিচ্ছায় বক্তব্যের সপক্ষে সহমত প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। কার্যকারণ সম্পর্কবিহীন পরিসংখ্যান কি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পন্থা হতে পারে?

৪) পার্থবাবু, আপনি চিঠির শেষে নির্দিষ্টভাবে, বৈজ্ঞানিক হিসাবে ক্রেডেনশিয়াল না থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

এই বিষয়ে বলি ব্রুণো নিজে বিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সে বিষয়ে দৃঢ়তা, জীবনদান, সমাজ প্রগতির পথে ব্রুণোকে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী করে তুলেছে। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে উৎপাদন বিকাশের বন্ধ্যা দশার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ও বিকাশ শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে। তাই সমাজ প্রগতির স্বার্থে এবং সমাজে বিদ্যমান শাসকশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কতিপয় ব্যক্তি বা সংস্থা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচার করে শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্র তাদের ক্রেডেনশিয়াল দেয় না, দিতে পারে না। এমনকি পূর্বে প্রদত্ত ক্রেডেনশিয়াল হরণ করে নেওয়া হয়। এর উদাহরণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে সহজলভ্য। বিপরীতে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশের স্বার্থে যারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারা শাসকশ্রেণীর ক্রেডেনশিয়াল-এর অপেক্ষায় থাকে না, কাজ করে যায়।

সবশেষে, শুধু পার্থবাবুকে নয়, তাঁর মতের পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জানাই। প্রচারিত মতাদর্শ দ্বারা আবেশিত হয়ে তার পক্ষে সওয়াল ক'রে, "বিশ্ব উষ্ণায়ন" সম্পর্কে প্রচারিত যুক্তিগুলিকে পুনরায় পাঠকদের মধ্যে যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। সমাজ বিকাশের পথে এই রূপ কতিপয় ব্যক্তি ও সংস্থার বর্তমান ভূমিকা ভবিষ্যতে স্বীকৃত বা বর্জিত হবে প্রগতির নিরিখে – বুর্জোয়া শ্রেণীর কোর্ট বা বিচারব্যবস্থায় নয়।

মনুষ্যসৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্বের এত প্রচার কেন?

"বিশ্বউষ্ণায়ন" বা "বিশ্ব শীতলায়ন"কে সামনে রেখে পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা পুঁজিবাদের সাধারণ নিয়ম। তবে কেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের মিথ্যা কারণগুলিকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মহল এবং এনজিওদের দ্বারা প্রচার করে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হচ্ছে? এর কারণ হল প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি, প্রকৃতির নিয়মগুলি ব্যাপক সাধারণ মানুষের অগোচরে রাখা। এটাই সমাজের পরিচালক শ্রেণীর উদ্দেশ্য। ব্যাপক সাধারণ মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠিত (গবেষক, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি) ব্যক্তিদের দ্বারা প্রচারিত মতকে বিনা বিচারে সঠিক বলে মনে করে। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে আইপিসিসি, বৃটিশ আবহাওয়া বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন এনজিওকে বিশ্ব উষ্ণায়ন-এর মিথ্যা কারণ প্রচারের কাজে লাগানো হয়েছে। অথচ এই সমাজেরই শিক্ষা ক্ষেত্রের উচ্চস্তরে, মহাকাশ বিদ্যা ও ভূবিজ্ঞানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, "বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি প্রাকৃতিক ঘটনা"। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সমাজের শাসকশ্রেণীর তথা পুঁজিপতিশ্রেণীর এরূপ দ্বিচারিতার কারণ প্রকৃতি বিজ্ঞানে নয়, সমাজ বিজ্ঞানে পাওয়া যাবে।

যে কথা আগে বলা হয় নি

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আবির্ভাবের পরে, পূর্ববর্তী সামন্তসমাজের প্রকৃতি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে বিজ্ঞান নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হয়। উৎপাদনের বিকাশ পূর্ববর্তী সকল সমাজ ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যায়। প্রকৃতি নির্ভর ধ্যান ধারণা বদলে যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ও প্রয়োগ ক্রমবর্ধমান হারে ঘটতে থাকে। প্রকৃতির নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হতে থাকে। মানুষের জ্ঞান চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন সমাজের শাসকশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করতে উৎপাদনের বিকাশের পথ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ অবরুদ্ধ করা শাসকশ্রেণীর অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে

দাঁড়ায়। কোন ঘটনার বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সম্পর্কের অনুপস্থিতিই অবৈজ্ঞানিক অধিবিদ্যক ধারণা রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও প্রশস্থ করে। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ব্যাপক সাধারণ মানুষকে ভাববাদী থেকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীতে পরিণত করে। যার দ্বারা সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যর প্রকৃত কারণ যে শ্রেণী বিভাজন – ভাগ্য বা পূর্ব জন্মের কর্মফল নয় – তা উপলব্ধি করতে পারে। তাই প্রকৃতির বিষয়ে মানুষের জানা সম্ভব নয়, এই ধারণা ব্যাপক সাধারণ মানুষের মধ্যে গড়ে তুলতেই বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক ধারণার প্রচার, বলা ভাল অপবিজ্ঞানের প্রচার করা হয়।

'বিশ্ব উষ্ণায়ন মানুষের সৃষ্টি' – বলার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় মানব সভ্যতায় ফসিল ফুয়েলের ব্যবহারের ফলে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা গ্রিন হাউস এফেক্ট বৃদ্ধি করে। পরিবেশের সাম্য স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার হয় শিল্প কারখানায়, যানবাহনে এবং রান্নার কাজে। শিল্প কারখানা কি বন্ধ করা সম্ভব? যানবাহন চলাচল বন্ধ করা সম্ভব? রান্নার জ্বালানী ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব?

না, সম্ভব নয়। সমাজে ব্যবহারিক জীবন এগিয়ে গেলে তা পিছোনো সম্ভব নয়। ফসিল ফুয়েলের বিকল্প কি বায়োফুয়েল? বায়োফুয়েল ব্যবহারের ফলে কি কাবর্ন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় না?

আমেরিকা, ইউরোপের মত উন্নত দেশগুলি, জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে কার্বন নির্গমণ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মেয়াদ শেষে কার্বন নির্গমণ বৃদ্ধি পাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

স্পষ্টতই, ফসিল ফুয়েল বিরোধী সবুজ সাম্রাজ্যবাদী লবির বায়োফুয়েল ব্যবহারের ঋণাত্মক বিজ্ঞাপন স্বরূপ, 'বিশ্ব উষ্ণায়ন মানুষের সৃষ্টি' আওয়াজের প্রচার, ফসিল ফুয়েল ব্যবহারের পক্ষের লবি, এর বিপরীতে 'কার্বন বাণিজ্যের' ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। যা হল এক নতুন ব্যবসা। সুতরাং, 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' সম্পর্কে পুঁজিবাদী লবিগুলি দ্বারা উথাপিত কারণ ও তার সমাধান নিজ নিজ পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও দখলের প্রচার মাত্র।

পুঁজিবাদী লবিগুলির মধ্যে পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও বাজার দখলের দ্বন্দ্ব ও তার প্রকাশ থাকলেও, ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক ধারণা পোষণের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তারা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ। তাই তো ফসিল ফুয়েল ব্যবহারের পক্ষের ও বিপক্ষের কোনো পুঁজিবাদী লবিই, 'বিশ্ব উষ্ণায়ন'-এর প্রকৃত কারণকে ব্যাপক সাধারণ মানুষের সামনে হাজির না করে আড়াল করেছে।

প্রাকৃতিক (মহাজাগতিক) কারণে 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' ও 'বিশ্ব শীতলায়ন' হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' সম্পর্কে কৃত্রিম উষ্ণ বক্তব্যের প্রচার ততদিনই থাকবে, যতদিন ব্যাপক সাধারণ মানুষকে প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ করে রাখা সমাজের পরিচালক শ্রেণীর পক্ষে জরুরী, যতদিন সমাজে উৎপাদনের বিকাশ শ্রেণী স্বার্থ দ্বারা অবরুদ্ধ থাকবে, যতদিন সমাজে শ্রেণী বৈষম্য থাকবে, যতদিন না পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। অর্থাৎ যতদিন না সমাজের ব্যাপক অংশের প্রকৃতি সম্পর্কে, প্রকৃতির নিয়মগুলি সম্পর্কে জানা সমাজ প্রগতির জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। ■

চিঠিপত্র ঃ

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের প্রচারিত চতুর্থবর্ষের ৩য় (ডিসেম্বর-২০১৪) সংখ্যায় প্রকাশিত বিশেষ রচনা – "শালগ্রাম শিলা এবং তার মাহাত্ম" আগ্রহ সহকারে পড়লাম। এই রচনায় "শালগ্রাম শিলা" আসলে কি তার উৎস কি এবং তার রাসায়নিক উপাদান কি এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্বামী বেদানন্দের মতবাদ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা বোধ হয় না আনলেই ভালো হতো।

আমি মনে করি ধর্ম হোল কিছু অনুশাসন যা সমাজকে কিছু নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে ধরে রেখেছে। এই বাঁধন যদি না থাকতো তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচার প্রাধান্য পেতো। গদ্য সাহিত্যের পাশাপাশি পদ্যও যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি বিজ্ঞান মনস্কতার পাশাপাশি ধর্ম ভিত্তিক মানসিকতারও প্রয়োজন আছে – তা না হলে সমাজ হবে রূঢ় বাস্তব / মরুময়।

তাই আমি মনে করি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের শুধু মাত্র নেতিবাচক দিক তুলে না ধরে যদি বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয় তবে এই ধরনের "বিজ্ঞান মসস্ক"র মুখপত্র আপামর জন-সাধারণের কাছে জনপ্রিয় হবে আশা করি।

১৫/০৫/২০১৫

ধন্যবাদ সহ –
ডঃ গুনময় চক্রবর্তী
পূর্বাশা হাউসিং, কলকাতা - ৫৪

সম্পাদকের জবাব

মাননীয় গুণময়বাবু,

চিঠিতে আপনি আপনার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন। সমীক্ষণের মতের সাথে সহমত হতে পারেননি। 'বিজ্ঞান মনস্ক' মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে জোর করে পাল্টাতেই হবে এমন মত পোষণ করে না, তবে যদি কোন অন্ধ বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানকে কেউ সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যদি অন্ধত্বের আগ্রাসন ঘটে তবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবেই। আপামর জনসাধারণের কাছে তা জনপ্রিয় হলো কি না তার বিচার আমাদের কাছে এর চেয়ে বড় নয়।

মাননীয় সম্পাদক,

সমীক্ষণের ২০১৪ অব্দের ডিসেম্বর সংখ্যাটি পড়ে আনন্দ পেলাম। ধর্মীয় ঘটনাবলীর বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া আজকাল অনেক দেশেই চলছে। সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত 'শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম...' প্রবন্ধটি আমি পড়িনি। তবে সমীক্ষণে প্রদত্ত উক্ত প্রবন্ধের দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে স্বামী বেদানন্দজী সেই রকম চেষ্টাই করেছেন। নিঃসন্দেহে তা ভুলে ভরা, বিভ্রান্তিকর, সুতরাং অগ্রহণযোগ্য। এই ধরনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হওয়া প্রয়োজন। সমীক্ষণ সেই প্রয়োজনীয় কাজটুকু যেভাবে সম্পন্ন করেছেন তা প্রশংসনীয়।

● ইবোলা সংক্রান্ত প্রবন্ধে সমীক্ষণ ইবোলাকে জীবাণু অস্ত্ররূপে প্রতিপন্ন করার জন্য যে যুক্তির অবতারণা করেছে তা অতিশয় দুর্বল। বরং বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ এবং সরকার যে অসাধারণ দ্রুততার সাথে ইবোলা সংক্রমণ রোধ করার চেষ্টা করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হতাশাজনক।

● 'বিজ্ঞানের খবর' বিভাগটি বেশ তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুচয়নিত।

● 'বিজ্ঞানে নোবেল...' প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে 'চন্দ্রশেখর লিমিট' আবিষ্কারক সুব্রাহ্মণ্য চন্দ্রশেখরকে উক্ত আবিষ্কারের বহু বছর পরে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 'নীল রঙ-এর এল.ই.ডি' আবিষ্কারককে অনেক বছর পরে নোবেল পুরস্কার দেওয়া খুব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার কি? তাছাড়া ব্রিটেনসহ বহুদেশে আজকাল 'সাধারণ লাইট বালব' প্রস্তুত আইনত নিষিদ্ধ। সেক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে এল.ই.ডি-এর বাজার প্রস্তুতের প্রশ্ন অবান্তর।

● বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রখ্যাত পদার্থবিদ রাদারফোর্ডকে রসায়ন বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় – পদার্থবিদ্যায় নয়। এ ধরণের উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। তা সব নিয়ে কেউ কোনও দিন প্রশ্ন তোলেনি। এবছরের রসায়নে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার 'কেমিক্যাল বায়োলজিস্ট'রাই বেশি ব্যবহার করছেন এবং ভবিষ্যতে তা করবেন। সে ক্ষেত্রে উক্ত উদ্ভাবনার জন্য ওই বিজ্ঞানীদেরকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া খুব অসঙ্গত মনে হয় কি?

ধন্যবাদান্তে

ননীভূষণ ফৌজদার

নতুনপল্লী, সোনারপুর, কলকাতা - ১৫০

মাননীয় ননীভূষণ বাবু,

পত্রের মাধ্যমে সমীক্ষণ পত্রিকার ২০১৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আপনার মতামত বিষয়গুলি নিয়ে পুনরায় চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করায় আপনাকে পত্রিকার পক্ষ থেকে জানাই ধন্যবাদ। আপনার পত্রে যে দুটি বিষয়ে সমালোচনা এসেছে তা হলো – (১) "ইবোলা ভাইরাস এইচ আই ভি'র মতই উদ্ভাবিত একটি শক্তিশালী জীবাণু অস্ত্র" এবং (২) "বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ ২০১৪"।

শেষ থেকে শুরু করি – কোন কিছু আবিষ্কারের বহু বছর পরে সেই বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রদান অবশ্যই আশর্যজনক নয়। তবে একথা অনিস্বীকার্য যে পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাটিতে আবিষ্কারের ২০-২৫ বছর পরে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল সম্মান প্রদান করার বিষয়ে বক্তব্যটি বিস্ময়সূচক। কিন্তু সঙ্গে বলা হয়েছে যে এই আবিষ্কারের প্রয়োগও সফলভাবে চালু হয়েছে বহু বছর আগে। অর্থাৎ তত্ত্ব - প্রমাণ ও প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে বহু দিন। যেমন ১৯৬৪ সালে পিটার হিগসের তত্ত্ব – **২০১২** সালে পরীক্ষাগারে প্রমাণ হয় – তার পরেই তিনি নোবেল সম্মানে ভূষিত হন। রচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, "নীল রঙের এল.ই.ডি আবিষ্কার ২০১৪ সালের তো মোটেই অনন্য সাধারণ ব্যাপার নয়" অর্থাৎ মৌলিক নয়। যেমন মানব সভ্যতায় দেশলাইয়ের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কিন্তু মৌলিক নয়। তাই দেশলাই আবিষ্কারের জন্য কাউকে নোবেল সম্মানে ভূষিত করা হলে আপনি কি লজ্জা পাবেন না? নাকি তাতে নোবেল সম্মানের মর্যাদা হানি হবে না? নীল আলোর এল.ই.ডি-র জন্য নোবেল সম্মান প্রদান করাটি কি সেরকম নয়? ননীবাবু আপনি আপনার পত্রে উল্লেখ করেছেন, "তাছাড়া ব্রিটেন সহ বহুদেশে আজকাল, সাধারণ লাইট বালব, প্রস্তুত আইনত নিষিদ্ধ"। এই আইন প্রণয়ন ও লাগু করার জন্য সামনে যে বক্তব্যই পেশ করা হোক না কেন – এই আইন উক্ত দেশগুলিতে এল.ই.ডি

লাইটের একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করবে কিনা?

রাদারফোর্ড তেজস্ক্রীয় মৌলের অর্ধায়ু ও মৌলান্তরের বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পান। পদার্থের অনু-পরমাণু সংক্রান্ত বিষয়গুলি পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার সাধারণ বিষয়। আপনার পত্রে আপনি উল্লেখ করেছেন, "এবছর রসায়নে ... কেমিক্যাল বায়োলজিস্ট'রাই বেশি ব্যবহার করছেন ... করবেন" প্রশ্ন হলো কোন ক্ষেত্রে আবিষ্কারটি ব্যবহার হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে কি সেই ক্ষেত্রের নোবেল ঘোষণা করা যায়? কেউ কোন দিন প্রশ্ন তোলে নি বলে – প্রশ্ন তোলা যাবে না – এরূপ কোনো স্বঃতসিদ্ধ নিয়ম আছে কি?

এবার আসা যাক ইবোলা প্রসঙ্গে।

আপনার পত্রে উল্লেখিত হয়েছে, "... ইবোলাকে জীবাণু অস্ত্ররূপে প্রতিপন্ন করার জন্য যে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা অতিশয় দুর্বল।"

যে কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা পরোক্ষ প্রমাণ দুর্বল হয়। যেমন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে, জাপানে পরমাণু বোমা নিক্ষেপের কথা আমেরিকা সরকার ঘোষণা করেছিল। যেমন বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন স্বীকার করে নেয়। এ সব ক্ষেত্রে ঐ ঘটনার জন্য আর কোন ব্যক্তি, সংগঠন ও রাষ্ট্রকে সন্দেহই করা যায় না। এগুলি হলো প্রত্যেক্ষ প্রমাণ। বহু কিছুই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা যায় না – এক পরোক্ষভাবে প্রমাণ করতে হয়। জীবাণু অস্ত্রতো প্রধানত "কোল্ড ওয়ারে" ব্যবহৃত হয়। আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা সংগঠন "জীবাণু অস্ত্র" ব্যবহার এর দায় স্বীকার করেছে বলে জানা নেই।

প্রকাশিত রচনার, "ইবোলা ভাইরাস কি জীবাণু অস্ত্র?"

শীর্ষক থেকে কয়েকটি বিষয় পুনরায় তুলে ধরা হল–

১) সংক্রামক রোগ ও জৈবসন্ত্রাসবাদের বিশেষজ্ঞ, নিউইয়র্কের ডাক্তার রবার্ট লেনিয়াদ্রো, লাইফ সায়েন্স পত্রিকাকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, সিডিসি ইবোলা ভাইরাসকে জৈবসন্ত্রাস সৃষ্টিকারী বস্তুরূপে তালিকাভুক্ত করেছে।

২) ইবোলা ভাইরাস জীবাণু অস্ত্ররূপে কতটা শক্তিশালী হতে পারে তা পরীক্ষা করার জন্য এবং ইবোলা প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের জন্য আমেরিকার ডিওডি ও এন আই এইচ ম্যাসাচুসেটাস ভিত্তিক Sarepta Therapicutices এবং কানাডা ভিত্তিক Tekmina Pharmacuticals এর মাধ্যমে গবেষণার জন্য কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে।

৩) ইবোলা ভাইরাসের সঙ্গে স্মলপক্স ও অন্যান্য রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসের অংশের আদান-প্রদান ঘটিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। যদি এই গবেষণা গুলি সফল হয় – তবে ইবোলা ভাইরাস উপযুক্ত জীবাণু অস্ত্র।

৪) ২০০৬ সালে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ এনিক আর পিয়াঙ্কা বিশ্বের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ কমানোর জন্য ইবোলা ভাইরাস ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন।

পত্রিকায় প্রকাশিত রচনায়, এই প্রসঙ্গে লিডনার্ড জি হোরোউইৎজ এর "ইমার্জিং ভাইরাসেস ঃ এইডস অ্যান্ড ইবোলা – নেচার অ্যাক্সিডেন্ট আর ইন্টেনশনাল" পুস্তক থেকে যা উল্লেখ করা হয়েছিল – তা পুনরায় চোখ বুলানোর জন্য অনুরোধ করলাম।

এই নিবন্ধে আক্রান্ত দেশগুলির সরকার-এর ভূমিকার প্রশংসা না করার অভিযোগ তুলেছেন, কিন্তু কোন তথ্য পেশ করেন নি কেন? পত্রিকার পক্ষ থেকে নিবন্ধের সূচনায় "২০১৪'র ইবোলার চালচিত্র" শীর্ষক-এ উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের পুনঃ উত্থাপন করা হল –

১) পরিস্থিতি সামাল দিতে লাইবেরিয়ায় ও নাইজেরিয়ায় জরুরী অবস্থা জারি করা হয়।

২) হু'র মতে আফ্রিকার এই রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার একটি প্রাথমিক শর্ত হলো সেখানকার বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগ প্রতিরোধের উপযুক্ত পোশাক সরবরাহ করা হয় না।

৩) খবরে প্রকাশিত বহু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জল পর্যন্ত সরবরাহ করা হয় না সবসময়। আতঙ্কে লাইবেরিয়ার সমস্ত স্কুল এবং রাজধানী মনোরভিয়া শহরে বেশিরভাগ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবছর ১২০ জনের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী ইবোলায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

৪) ৯/১০/২০১৪ এর "এই সময়" পত্রিকায় সিয়েরা লিওনে ও লাইবেরিয়াতে সরকারী অব্যবস্থার কথা প্রকাশিত হয়েছিল। যা পত্রিকার রচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এই তথ্যগুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে সংগৃহীত। সমীক্ষণ পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর কল্পনা প্রসূত নয়। রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা আর অবস্থার সামাল দেওয়ার চেষ্টা – দুটি ভিন্ন বিষয়। অবস্থার সামাল দেওয়ার নামান্তর যদি ইবোলা সংক্রমণ রোধ করার চেষ্টা হয় তবে তার অভিজ্ঞতা পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের কমবেশি আছে।

ননীভূষণ বাবু, আপনার পত্রের বক্তব্য অন্যান্য আরো অনেক পাঠকের বক্তব্যও হতে পারে। তাই আপনার পত্র আরো অনেকের অপ্রকাশিত বক্তব্যের চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে।

নিবন্ধ

নেপালের বিধ্বংসী ভূমিকম্প

কতগুলি প্রশ্ন ও তার ব্যাখ্যা

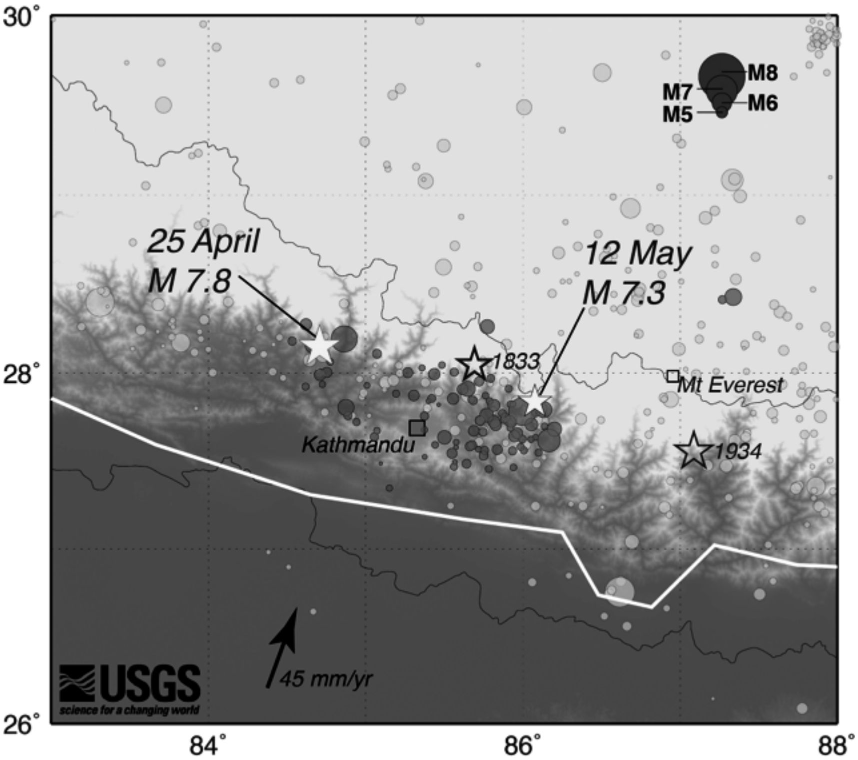

নেপাল ভূমিকম্পের বর্তমান ও অতীতের উপকেন্দ্রগুলি

গত ২৫শে এপ্রিল ২০১৫, আন্তর্জাতিক সময় ৬ টা ১১ মিনিটল ২৫ সেকেন্ডে (ভারতীয় সময় ১১ টা ৪১ মিনিট ২৬ সেকেন্ড) ৭.৮ রিখটার স্কেলের এক বিশাল ভূমিকম্প হিমালয়কন্যা নেপাল এবং সংলগ্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এই ভূমিকম্প নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুসহ বিভিন্ন অঞ্চল, চীনের দক্ষিণাংশ, পূর্ব, উত্তরপূর্ব এবং উত্তরভারতের রাজ্যগুলি, ভূটান, বাংলাদেশ, মায়ানমারসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। ঘরবাড়ি, ধর্মস্থান, ব্রীজ, রাস্তা, বাঁধ, বড় বড় টাওয়ার ধ্বংস হয়। প্রায় ১০ হাজারের অধিক মানুষ মারা যান, আহত হন তার কয়েকগুণ। আতঙ্কগ্রস্থ মানুষ গৃহহীন হয়ে পথে নেমে আসেন। এই ভূমিকম্পের পর প্রায় একমাস ধরে চলেছে ছোট-মাঝারি-বড় মাপের দুই শতাধিক ভূমিকম্প, বিজ্ঞানীরা যাকে আফটার শক বলেন। ২৫শে এপ্রিলের ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১৫ কি.মি নীচে অবস্থিত ছিল যার উপকেন্দ্র বা এপিসেন্টার হল ২৮.১৪৭ ডিগ্রি উঃ অক্ষাংশ ৮৪.৭০৮ ডিগ্রি পূঃ দ্রাঘিমাংশে যা নেপালের লামজুং থেকে ৩৪ কি.মি পূর্ব দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এবং নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুর ৭৭ কি.মি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বড় আফটারশকগুলির মধ্যে ১২ই মে ২০১৫-র দুটি হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। ১২ই মে আন্তর্জাতিক সময় ৭ টা ০৫ মিনিট ১১ সেকেন্ডে ২৭.৮১৯ ডিগ্রি উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৬.০৮০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র অবস্থান করে। এই আফটার শকটি নেপালের কোডারি থেকে ১৯ কি.মি দক্ষিণ-পূর্বে এবং কাঠমন্ডু থেকে ৭৫ কি.মি পূর্বে অবস্থিত। এই ভূমিকম্পটির মাত্রা রিখটার স্কেলে ৭.৩ যা বড় ভূমিকম্পের সমান। এতে নতুন করে ২১৮ জন মারা যান এবং ৩৫০০ জন আহত হন। ওইদিনই আন্তর্জাতিক সময় ৭ টা ৩৬ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডে নেপালের রামেচপালের ৩২ কি.মি উঃ উঃ পূর্বে এবং কাঠমন্ডুর ৮৪ কি.মি পূর্বে ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয় (চিত্র ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র)। এতেও ভাল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রায় একমাস যাবৎ লাগাতার হয়ে চলা ভূমিকম্পে নেপাল এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের অধিকাংশের মনে এই প্রশ্নই জেগে ওঠে যে হিমালয় কি ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যাবে? এই কি সেই

মহাপ্রলয়ের শুরু?

একের পর এক ভূমিকম্প এবং তাকে নিয়ে নানা গুজব, একের পর এক মৃত্যুর খবর, স্বজন হারানো মানুষের আর্তনাদ আর মিডিয়ার সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে প্রচার এক স্থায়ী আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র ভয় এবং আতঙ্কেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ভূমিকম্পের কারণ নিয়ে মিডিয়ায় বহু বিজ্ঞানীরা এর বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাই আজও প্রধান ভাবে টিঁকে আছে এই কারণে ভূমিকম্পের বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে আমাদের সংক্ষেপে জেনে নেওয়া দরকার।

ভূমিকম্পের কারণ

ভূমিকম্প, তার ফলে সৃষ্ট সুনামির মত ঘটনা, অগ্নুৎপাত ইত্যাদি কোন একটি অঞ্চলে যেহেতু নিয়মিত ঘটে না তাই অধিকাংশ মানুষই মনে করেন যে এই ঘটনাগুলি সবই ব্যতিক্রমী অলৌকিক ঘটনা, কোন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে সেগুলি ঘটে না। জোয়ার-ভাটা, দিন-রাত, ভূমিক্ষয়, পলিসঞ্চয়, বৃষ্টিপাত-তুষারপাতের মত প্রাকৃতিক ঘটনা মানুষ নিয়মিত প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেন, ভূমিকম্প নয়। তাই ভূমিকম্পকে মানুষ অপ্রাকৃতিক ও আকস্মিক ঘটনা মনে করেন। অথচ ইউ এস জিওলজিক্যাল সার্ভের ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফরমেশন সেন্টার (এন ই আই সি) এর হিসাব অনুযায়ী গড়ে পৃথিবীতে প্রতিবছর ভূমিকম্প হয় ৩০ হাজারের বেশি। এর মধ্যে ২৫টি ক্ষেত্রে বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানি ঘটে থাকে। প্রায় প্রত্যহ হয়ে চলা ভূমিকম্পগুলির মধ্যে রিখটার স্কেলে ৫ মাত্রার উপরে হলে কিছু মানুষ টের পায়, ৬ মাত্রার উপরে হলে সাধারণত ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রতিবছর হওয়া ৩০ হাজারের অধিক ভূমিকম্পের মাত্র ২৫ টি মত ক্ষেত্রে (সমগ্র বিশ্বব্যাপী) তা খবর হয় বাকিগুলির অধিকাংশ মানুষের অনুভূতির বাইরে থাকে। কোন একটি অঞ্চলে ৫০/৬০/৮০ বছর পর এমন বড় ঘটনা ঘটায় একে আকস্মিক বলেই মানুষ মনে করেন।

ভূমিকম্পের বিজ্ঞান জানতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে এই পৃথিবীকে। প্রায় গোলাকার এই পৃথিবীর অভ্যন্তর সমসত্ব বা homogenenus নয়। এর ভিতরের দিকে যত যাওয়া যায় ততই তা উষ্ণ। একদম উপরের কঠিন স্তর হল ক্রাস্ট, তারপর গুরুমন্ডল (ম্যান্টল) এবং কেন্দ্র (কোর)। এই ক্রাস্ট এবং গুরুমন্ডলের একাংশ কঠিন ও ভঙ্গুর, এই স্তরের গড় বেধ প্রায় ১০০ কি.মি। একে বলা হয় লিথোস্ফিয়ার। এই লিথোস্ফিয়ার কিন্তু অখন্ড-সমগ্র নয়, বরং কতগুলি টকুরো টুকরো খন্ডে বিভক্ত। চামড়ার ফুটবলের যেমন টুকরো টুকরো চামড়া সেলাই করে তার উপরিতল গঠিত ঠিক তেমনই। এই লিথোস্ফিয়ারের খন্ডগুলির বেধের তুলনায় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড় বলে একে প্লেট

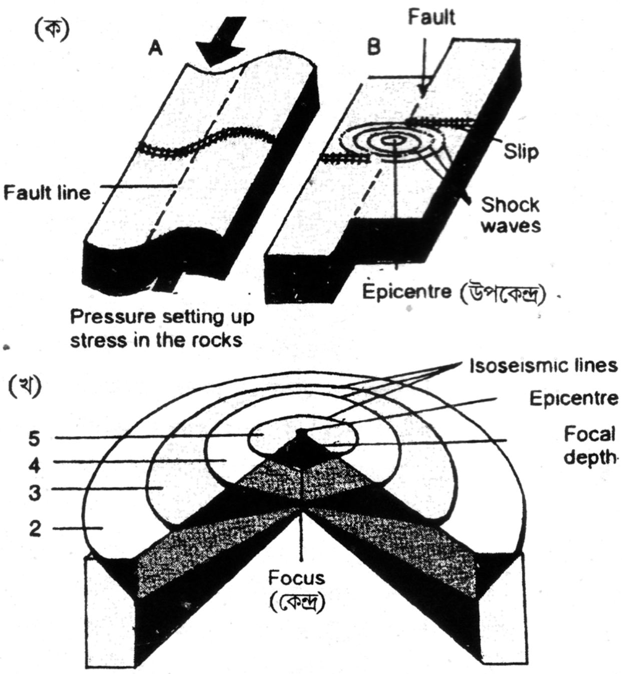

ভূমিকম্পের কারণ

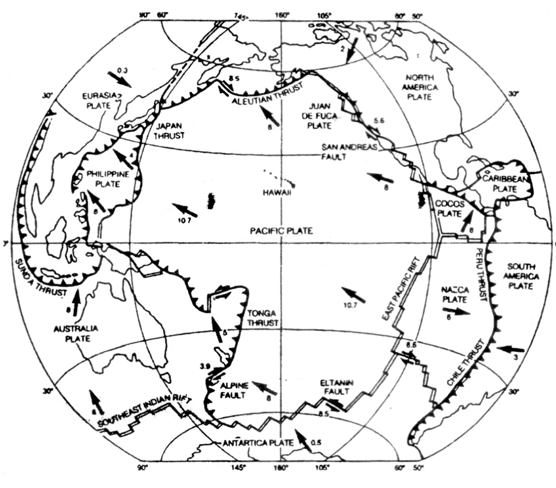

বিভিন্ন প্লেট ও তার গতির অভিমুখ

বলা হয়। এরকম ৭টি বড় ৬টি মাঝারি এবং ৯-১০টি ক্ষুদ্র এবং অতিক্ষুদ্র প্লেট দিয়ে বর্তমান পৃথিবীর উপরিস্তর গঠিত। এই লিথোস্ফিয়ারের নিচে আছে অর্ধতরল, সমসত্ব এবং গরম পদার্থের স্তর। একে বলে অ্যাসথেনোস্ফিয়ার। অ্যাসথেনোস্ফিয়ারের তাপের পরিচালন গতির ফলে উপরের কঠিন লিথোস্ফিয়ারের উপর নানা বল ক্রিয়া করে। এর ফলে এই লিথোস্ফিয়ারিক প্লেটগুলি একে অপরের তুলনায় গতিশীল থাকে পরস্পর অভিমুখে, পরস্পরের বিপরীতে বা পাশাপাশি। এই প্লেটগুলির গতিশীলতার জন্য দুই প্লেটের সীমান্ত স্থিতিশীল না থেকে অস্থির থাকে। এখানে নিয়মিত চ্যুতি, ভূমিকম্প/ অগ্নুৎপাত, পাথরের ভাঙন-রূপান্তর, গঠন প্রণালীর পরিবর্তন, পলির সঞ্চয় ইত্যাদি টেকটনিক ক্রিয়া চলতে থাকে। প্লেটের অভ্যন্তর টেকটনিকভাবে তুলনায় স্থির এবং অপরিবর্তনীয়।বড় বড় চ্যুতির ঘটনায় প্লেটের মধ্যে ফাটল এবং ফাটলের দুই অংশের বিপরীতমুখি চলন নতুন প্লেটের জন্ম দিচ্ছে আবার দুই প্লেট সীমান্ত নীচের অ্যাসথেনোস্ফিয়ারিক প্লিউমের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়ায় সংযুক্ত হয়ে একটি প্লেটে অঙ্গীভূত হয়। প্লেট সীমান্ত ৩ প্রকার – **কনভারজেন্ট** (যেখানে দুই প্লেট পরস্পরের অভিমুখে আসে), **ডাইভারজেন্ট** (দুই প্লেট পরস্পরের বিপরীতে যায়) এবং **ট্রান্সফরম** (দুই প্লেট পাশাপাশি যায়)। বর্তমানে পৃথিবীর সব ধরনের প্লেট সীমান্ত অঞ্চলগুলি হল ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। প্লেট সীমান্ত ছাড়া প্লেট অভ্যন্তরের বড় বড় চ্যুতিতল অঞ্চলেও প্লেটের সরণের ফলে ভূমিকম্প হয়। কনভারজেন্ট ও ডাইভারজেন্ট প্লেট সীমান্তে এবং প্লেট অভ্যন্তরে নিচের ম্যান্টল প্লিউমের কার্যকারিতায় সৃষ্ট হট স্পটে (যেমন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ) অগ্নুৎপাত হয়। ট্রান্সফরম প্লেট সীমান্তে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান অ্যানড্রিয়াস চ্যুতিতল অঞ্চল) অগ্নুৎপাত হয় না। পৃথিবীর উপরিতলে এই ধরনের গঠনের পরিবর্তন, ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, পলিসঞ্চয়, পলিক্ষয়, পাথরে ফাটল রূপান্তর এবং গঠনের পরিবর্তন সব কিছুর জন্য দায়ী নিচস্থ তাপশক্তি এবং তদজ্জনিত ক্রিয়াশীল নানা ধরনের বল। সূর্য শক্তি এবং তার কারণে বায়ুমন্ডলে যে বলগুলি ক্রিয়া করে তা জলবায়ু এবং ভূমির উপর পরিবর্তন ঘটায় (Weathering, errosion ইত্যাদি)। ভূমিকম্প বা অগ্নুৎপাতের সাথে আবহাওয়া পরিবর্তনের, ঝড় বৃষ্টি, তুষারপাতের দিন-রাতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। সূর্যশক্তির প্রভাব এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ কারণে এই ধরনের পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বলে টেকটনিক প্রক্রিয়া এবং বর্তমানে তাকে ভিত্তি করে যে তত্ত্বের সাহায্যে এই ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করা হয় তাকে বলা হয় প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব।

এই প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব অনুসারে অ্যাসথেনোস্ফিয়ারের মধ্যে তাপের পরিচলন গতির ফলে লিথোস্ফিয়ারের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ফাটলের দুই অংশের প্রস্তর খন্ডের মধ্যে সৃষ্ট বলের দ্বারা গতির সৃষ্টি হয়। এই গতির ফলে প্রস্তর খন্ডের মধ্যে shearing stress (কৃন্তন পীড়ন) সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এই পীড়নের মাত্রা বাড়তে বাড়তে একময় প্রস্তরখন্ডের স্থিতিস্থাপক সীমা (elastic limit) ছাড়িয়ে যায়। তখন ফাটলের দুই পাশের দুই ব্লক চ্যুতিতল (fault plane) বরাবর চ্যুতি (fault) ঘটে। এর ফলে দুই ব্লক একে অন্যের তুলনায় উপর নিচে বা পাশাপাশি সরে যায়। এই ক্রিয়ার ফলে যে বিপুল গতিশক্তি সৃষ্টি হয় তার একটা অংশ পাথরের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে তাপ সৃষ্টি করে, এক অংশ চ্যুতিতল বরাবর প্রস্তরখন্ডগুলির সরণ ঘটায় আর বাকি অংশ ভূকম্পজাত তরঙ্গের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে উপরে উঠে এসে প্রস্তখন্ডদ্বয়কে কম্পিত করে, ভূমিতলে নতুন নতুন ফাটলের জন্ম দেয়, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট সব কিছু (ঘরবাড়ি, রাস্তা, ব্রীজ) উপর ধ্বংস ক্রিয়া চালায়। উৎপত্তিস্থলের গভীরতা (কেন্দ্র বা হাইপোসেন্টার) অনুসারে ভূমিকম্প ৩ প্রকার – শ্যালো বা কম গভীরতার, ০-৭০ কিমি; ইন্টারমিডিয়েট বা মধ্য গভীরতার, ৭০-৩০০ কিমি এবং ডীপ বা গভীর, ৩০০-৬৭০ কিমি। ভূমিকম্পসৃষ্ট তরঙ্গ ৩ প্রকার – পি ওয়েভ, এস ওয়েভ এবং নানা প্রকার সারফেস ওয়েভ। এই সারফেস ওয়েভগুলিই ধ্বংস সাধনে প্রধান ভূমিকা নেয়। **ভূমিকম্পের মাত্রা (মাপা হয় রিখটার স্কেলে), গভীরতা, কেন্দ্রস্থলের পাথর ও মাটির উপাদান এবং গঠন বৈচিত্র এবং অঞ্চলে মানুষের বসতি, ঘরবাড়ি কি রকম এবং জলস্তরের মাপ ইত্যাদির উপর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে**। ভূমিকম্প ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে হলে এবং সেখানকার ঘরবাড়ি, স্থাপত্যগুলি ভূমিকম্প প্রতিরোধক হিসাবে না তৈরি হলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক বেড়ে যায়।

অতএব অলৌকিক কারণে নয়, প্রাকৃতিক নিয়মে (যাকে বিজ্ঞান অনেকাংশেই ব্যাখ্যা করতে পারে) ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক ঘটনা পৃথিবীজুড়ে নিয়ত ঘটে চলেছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, শাঁখ বাজিয়ে, আজান দিয়ে ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক কারণে তা নিয়ত ঘটতেই থাকবে।

বর্তমানে পেজার (Prompt Assesment of Global Earth-

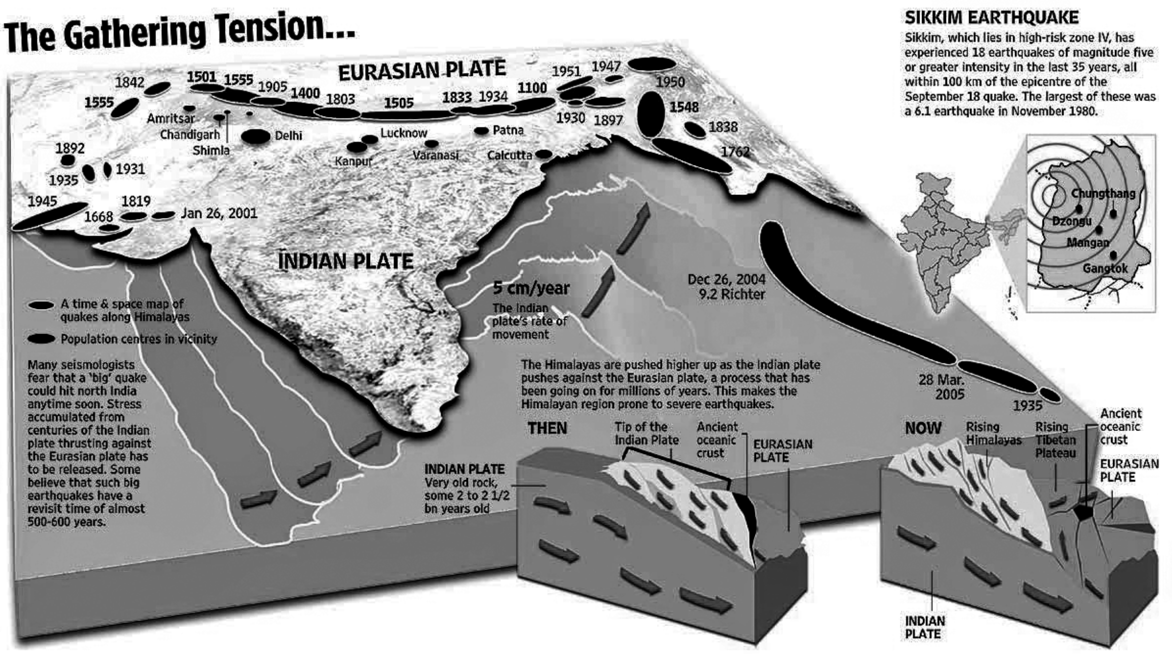

ইন্ডিয়ান প্লেট সীমান্তে ভূমিকম্পের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

quakes for Response) নামক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূমিকম্পের ৩০ মিনিটের মধ্যে তার উৎসস্থল, মাত্রা এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক অনুমান করা সম্ভব হচ্ছে। ইউ এস জিওলজিক্যাল সার্ভে বিশ্বে প্রতিনিয়ত হয়ে চলা ভূমিকম্পের কারণ, উৎসস্থল, মাত্রা, ক্ষয়ক্ষতির অনুমান এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট করে পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে চলেছে। এই কাজে প্রচুর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রচুর বিজ্ঞানী প্রতিনিয়ত কর্মরত আছেন।

নেপালের সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের কারণ ও তার ব্যাখ্যা

বিজ্ঞানীদের মতে, ভারতীয় প্লেট হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরাংশ বাদে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভারত মহাসাগরের একাংশ, নেপাল-ভূটানের একাংশ নিয়ে গঠিত। বর্তমানে তা গড়ে প্রতিবছর ৪৫ মিলিমিটার বেগে উত্তর-উত্তর-পূর্ব দিকে ইউরেশিয়া প্লেটের দিকে ধাবিত। তিব্বতের মালভূমিসহ ইউরেশিয়া প্লেটেও বছরে গড়ে ২০-২৫ মিলিমিটার বেগে দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ধাবিত। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই প্লেটগুলি সমবেগে ধাবিত হয় না, সময়ভেদে এর গতির পরিবর্তন হয়। এই প্লেট সীমান্তেই আছে হিমালয় পর্বতমালা যা একপ্রকার কন্টিনেন্ট-কন্টিনেন্ট কনভারজেন্ট প্লেট বাউন্ডারি। এখানে দুই বিশাল আকৃতির লিথোস্ফিয়ারিক প্লেট মুখোমুখি সংঘর্ষরত এবং ভারতীয় প্লেট (এর বড় অংশ সামুদ্রিক লিথোস্ফিয়ার দ্বারা গঠিত বলে অনেক ভারী) ইউরেশিয় প্লেট (মহাদেশীয় হওয়ায় তুলনায় হালকা) এর নিচে আংশিকভাবে প্রতিনিয়ত ঢুকে যাচ্ছে, এক অংশ মুখোমুখি সংঘর্ষ করছে এবং কিছু অংশ (চ্যুতিতলের বিশেষ অবস্থানের জন্য) উপরে উঠেও যাচ্ছে। এই প্লেট সীমান্তে প্রতিনিয়ত ভূত্বকের কুঞ্চন এবং গভীরতাবৃদ্ধি ঘটছে। এর ফলে হিমালয় পর্বতমালা তার সৃষ্টি থেকে আজও ক্রিয়াশীল অঞ্চল এবং গড়ে তার উচ্চতা বছরে ১৮ মিলিমিটার বাড়ছে। এই প্লেট সীমান্তে লিথোস্ফিয়ারের আয়তন কমে চলেছে অর্থাৎ পৃথিবী ছোট হচ্ছে। আবার ডাইভারজেন্ট প্লেট সীমান্তে নীচের ম্যাগমা উঠে এসে পৃথিবীর আয়তন বাড়ায়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, প্রায় ১২ কোটি বছর আগে থেকে ভারতীয় প্লেট দক্ষিণ গোলার্ধের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে গন্ডোয়ানা ল্যান্ড ভেঙ্গে সরতে সরতে শেষে এসে উত্তর গোলার্ধে ইউরেশিয় প্লেটের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সমুদ্রের (বিজ্ঞানীদের ভাষায় টেথিস) পলি দুই দিকের প্রবল চাপে কুঞ্চিত হয়ে হিমালয়ান ফোল্ড মাউন্টেইন তৈরি করেছে।

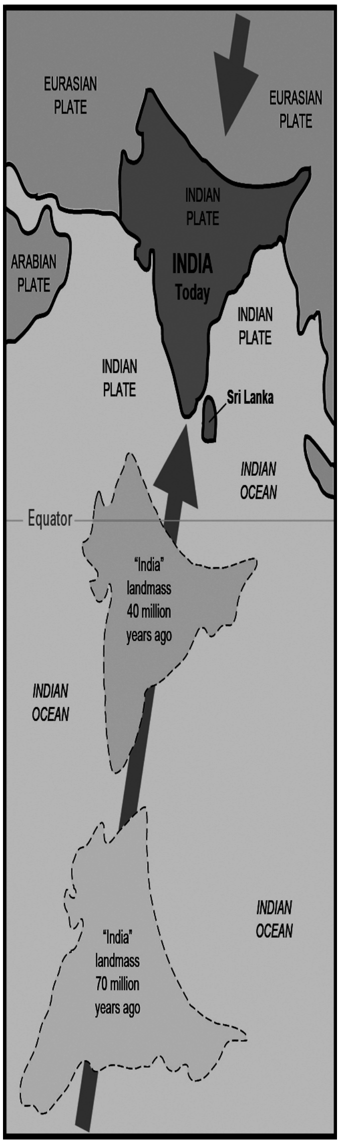

১২ কোটি বছর ধরে ইন্ডিয়ান প্লেটের উত্তরমুখী যাত্রা

পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালায় ভারতের দিক থেকে চীনের দিকে গেলে আমরা ৩টি বড় ধরনের চ্যুতিতল দেখতে পাই যা হিমালয়কে জিওলজিক্যালি তিনভাগে ভাগ করেছে। এগুলি হল যথাক্রমে **মেইন ফ্রন্টাল থ্রাস্ট, মেইন বাউন্ডারি থ্রাস্ট** এবং **মেইন সেন্ট্রাল থ্রাস্ট**। এই চ্যুতিতল বা উল্টোচ্যুতি (থ্রাস্ট প্লেন) বরাবর প্রতিনিয়ত ভারতীয় প্লেট ইউরেশিয় প্লেটের নিচে নেমে যাচ্ছে। এগুলিকে থ্রাস্ট প্লেন বা উল্টোচ্যুতি বলা হচ্ছে কারণ চ্যুতিতল বরাবর ঝুলন্ত ব্লকটি (এক্ষেত্রে ইউরেশিয় প্লেটের অংশ) অভিকর্ষের বিপরীতে উপরে উঠছে। এই ৩টি প্রধান চ্যুতিতল বা থ্রাস্ট প্লেন অঞ্চল ছাড়াও ছোট বড় নানা চ্যুতিতল রয়েছে হিমালয় পর্বতমালায় (প্রতিবার ভূমিকম্পের ফলে নতুন চ্যুতিতলের জন্মও হচ্ছে) যেখান প্লেটের সরণের ফলে নানা ধরনের ভূমিকম্প হয়। বর্তমানের নেপালের ভূমিকম্পের কেন্দ্র হল মেইন ফ্রন্টাল থ্রাস্ট। এই থ্রাস্ট প্লেনগুলি প্রায় সবই হিমালয়ের বিস্তারের সমান্তরাল (পূর্ব-পশ্চিম অভিমুখে)। এই তলগুলি কোথাও কোথাও কুঞ্চিত বা ফোল্ডেড হয়ে গেছে প্রবল চাপে। ২৫শে এপ্রিলের ভূমিকম্পে ১০০ কিমি × ৫০ কিমি মাপের ভারতীয় প্লেটের অংশ ইউরেশিয় প্লেটের নিচে নেমে গেছে এবং ইউরেশিয় প্লেটের অংশ উঠে এসেছে। এই ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে বিপুল ভূকম্পজাত শক্তি (সিসমিক এনার্জি) প্রধানভাবে পূর্ব অভিমুখে কাঠমান্ডুর দিকে তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ভূমিকম্পের শক্তি নির্গত হয়েছে প্রায় ৮০ সেকেন্ড ধরে, এর মধ্যে মাঝের ২০ সেকেন্ডে এর তীব্রতা ছিল সর্বাধিক। ভারতীয় প্লেট এবং ইউরেশিয় প্লেটের সীমান্ত ঐতিহাসিকভাবেই বড় মাত্রার ভূমিকম্পের কেন্দ্র। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই অঞ্চলে ৬ মাত্রা বা তার অধিক মাত্রার ৪টি বড় ভূমিকম্প ঘটেছে। ১৯৮৮ সালের অগাস্ট মাসে ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল বর্তমান উপকেন্দ্র থেকে ২৪০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে এবং এই ঘটনায় ১৫০০ মানুষ মারা যান। ১৯৩৪ সালে নেপাল-বিহার সীমান্তে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয় ১৯৮৮ সালের ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের কাছে, যে সময় প্রায় ১০ হাজার ৬০০ মানুষ নিহত হন। ১৮৩৩ সালে হওয়া বড় ভূমিকম্পটি বর্তমান ভূমিকম্পের উৎসস্থলের খুব কাছে অবস্থিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে দুই প্লেট সীমান্তের সরণের ফলে চ্যুতিতলের সক্রিয়তায় ভূমিকম্প হয়। তবে গোটা প্লেট সীমান্তের সরণ একসাথে হয় না। সমগ্র প্লেট সীমান্তের কোন বিশেষ অংশে (ব্লক) পীড়ণের মাত্রা স্থিতিস্থাপক সীমা ছাড়িয়ে গেলে সেই অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র হল চ্যুতিতলে (মাটির গভীরে) অবস্থিত সেই বিন্দু যেখান থেকে সিসিমিক এনার্জি নির্গত হওয়া শুরু হয়।

২৫শে এপ্রিলের ভূমিকম্পের বড় লিথোস্ফিয়ারিক প্লেট দুটির স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত অসংখ্য আফটার শক চলতে থাকে। গত একমাসে দুই শতাধিক আফটার শক হয়েছে যেগুলির অধিকাংশই ৩ মাত্রার কাছাকাছি, কিছু ৫ মাত্রার কাছাকাছি। ১২ই মে ২ ঘন্টায় ৬টি আফটার শক হয়েছে। একটি ৭.৩ মাত্রার এবং অপরটি ৬.৩ মাত্রার। সাধারণভাবে কোনো বড় ভূমিকম্পের কয়েক সপ্তাহ এমনকি মাসাধিক কাল ধরে আফটারশক চলে। তবে সময়ের সাথে সাথে তার মাত্রা ও তীব্রতা কমতে থাকে।

প্রায় প্রতিনিয়ত ভূমিকম্পে (আফটারশক) নতুন ধরনের বিপদ সৃষ্টি হয়েছে যেমন ল্যান্ডস্লাইড বা ভূমিধ্বস এবং লিকুইফ্যাকশন বা ভূগর্ভস্থ মাটির তরলের ন্যায় আচরণ। এই ঘটনাগুলি নেপালের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী বর্ষায় নেপাল ও পূর্ব-উত্তরপূর্ব হিমালয়ের পাহাড়ে ধ্বসের সংখ্যা বাড়বে বলে অনুমান করা যায়।

ভূমিকম্পের সময় আমরা কী করব?

প্রথমত আমরা যদি এটা বুঝি যে ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক নিয়মে হয় তবে অযথা আতঙ্কিত হয়ে পড়ব না। সারিবদ্ধভাবে তুলনায় নিরাপদ স্থানে অবস্থান করব। যানবাহন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। পৌরসভা বা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে বিপজ্জনক ঘরবাড়ির সংস্কারের দাবি করব। মনে রাখতে হবে একটা বড় ভূমিকম্পের পর কয়েক সপ্তাহ বা মাসাধিককাল আফটারশক চলতে পারে। ভূমিকম্পের পর পাহাড়ী এলাকায় ধসের প্রবণতা বাড়বে।

নেপাল (গোর্খা) ভূমিকম্পে কাঠমন্ডু এত ক্ষতিগ্রস্ত হল কেন?

২৫শে এপ্রিল ২০১৫'র গোর্খা ভূমিকম্প এবং পরবর্তী কালের আফটার শকগুলিতে নেপালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ রাজধানী কাঠমন্ডুতে সর্বাধিক। এর কারণ কী?

বিজ্ঞানীদের মতে নেপালের রাজধানী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে (জোন ৫) অবস্থিত। এর জনসংখ্যা ১৪ লক্ষ ৪২ হাজারেরও বেশি। এবারের ৭.৮ রিখটার স্কেলের প্রধান ভূমিকম্প এবং আফটারশকগুলির কেন্দ্র ছিল মাটির মাত্র ১৫ কিমি নিচে। ভূমিকম্পের ফলে স্থাপত্য ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নির্ধারক মার্সেলী স্কেল অনুসারে কাঠমন্ডুতে প্রভাব পড়েছে স্কেল VIII (ভয়াবহ বা সিভিয়ার) ধরনের। কাঠমন্ডু হিমালয়ের একটি উপত্যকায় অবস্থিত, যা প্রাচীন লেক জাত পলি দ্বারা গঠিত। ৫০০ মিটার গভীর এই পলির স্থানীয় নাম কালিমাটি। এই কালিমাটির উপর আছে মোটা দানা বালি এবং নুড়ির স্তর যা বাগমতী নদীর পলি। এর নিচের কোয়াটারনারি (১ লক্ষ বছর বা তার কম) যুগের পলিগুলি নদী ও লেকজাত এবং কাদা, বালি ও নুড়ি দিয়ে তৈরি। আংশিক প্রস্তরীভূত এবং অপ্রস্তরীভূত এই পলি প্রবল ভূকিম্পের সময় সহজেই লিকুইফ্যাকশন ঘটাতে পারে অর্থাৎ তরল পদার্থের ন্যায় আচরণ করে। এছাড়া কাঠমন্ডুর ভূপৃষ্ঠের নিচের জলতল (গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল) উঁচুতে থাকায় মাটির নিচে ভূমিকম্পের প্রভাব অনেক বেশি পড়েছে। এছাড়া লেক ও নদীজাত পলিস্তর হওয়ায় অঞ্চলভেদে তার উপাদান ও গভীরতার প্রচন্ড ফারাক আছে। এর ফলে এই অঞ্চল সিস্মিক ওয়েভগুলিকে স্থানে স্থানে ট্র্যাপিং ও ফোকাসিং করে অনুরণন (রেজোনেন্স) ঘটায়।

কোনো অঞ্চলে রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা কোনো নরম পলিতে ভূকম্পজাত তরঙ্গকে অ্যাম্প্লিফ্লাই করে অল্প দূরত্বের মধ্যে।

অন্যান্য বহু শহরের ন্যায় কাঠমন্ডু ঘনবসতিপূর্ণ। এখানকার অধিকাংশ ঘরবাড়ি, স্থাপত্যগুলি ভূকম্প প্রতিরোধক হিসাবে তৈরিও হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত। ফলে যা ঘটবার তা-ই ঘটেছে। হাজারে হাজারে মানুষ মারা গেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে উপরে উল্লিখিত বিশেষ বৈজ্ঞানিক কারণে অতি সম্প্রতি হওয়া সিকিম ভূমিকম্পে গ্যাংটকের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল, এবারের গোর্খা ভূমিকম্পে কাঠমন্ডুতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তার অনেক বেশি।

রাজ্যের উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের শহরগুলি কি নিরাপদ?

এই চর্চা থেকেই প্রশ্ন উঠছে তবে কি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলি এবং দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-হাওড়া এবং অন্য ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিও বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে?

এক কথায় এর জবাব হয় না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিপদের সম্ভাবনার মাত্রার ফারাক আছে। উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশের শহরগুলি প্লেট সীমান্তের যথেষ্ট নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। প্লেট সীমান্তে হওয়া বড় বড় ভূমিকম্পের প্রভাব দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-হাওড়া বা কৃষ্ণনগর-বারাসতের তুলনায় উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে অবশ্যই বেশি প্রভাব ফেলে। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের আসানসোল, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর শহর স্থিতিশীল মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় (জোন ২ এবং ৩) এইসব অঞ্চলে প্রকৃতিজাত ভূমিকম্পের প্রভাব অনেক কম পড়ে।

আলোচনার সুবিধার জন্য উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি এবং দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা শহরকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। শিলিগুড়ি শহরের ভূমি নদী ও লেকজাত নমর পলি ও পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত। এখানকার মাটির চরিত্র কাঠমন্ডুর মাটির চরিত্রের (উপাদান ও বৈশিষ্ট) সাথে বিশেষ ফারাক নেই। প্লেট সীমান্তের ১৫০-২০০ কিমি'র মধ্যে অবস্থান করায় এখানে নেপাল-ভূটান-সিকিমের মত না হলেও ভূমিকম্পের প্রভাব যথেষ্ট হতে পারে।

অন্যদিকে কলকাতা শহর প্লেট সীমান্ত থেকে অনেক দূরে (৬০০-৭০০ কিমি) অবস্থিত (জোন ৩)। যদিও সুন্দরবন অঞ্চলের নিচের এবং বেঙ্গল বেসিনের অভ্যন্তরস্থ কয়েকটি চ্যুতিতল সক্রিয় হলে কলকাতার উপকণ্ঠেও বিশাল সময় অন্তরে

ভূমিকম্পের কেন্দ্র দেখা যেতেই পারে। এছাড়া হিমালয়ের পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ৮ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প হলে শিলিগুড়িতে যেমন বড় ক্ষতি হতে পারে, কলকাতার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলেও তেমনই। কলকাতার নিচের পলি সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটা জনিত নদীর পলি বা টাইডাল ডেল্টা দ্বারা গঠিত এবং এর মূল উপাদান কাদা মাটি বা সিল্ট এবং ক্লে, সামান্য মিহি এবং বড় দানার বালি এবং পীট দ্বারা গঠিত, সাথে কিছু নুড়ি আছে। এই মাটির পীড়ন ক্ষমতা খুব কম। এখানকার জলস্তরও যথেষ্ট উপরে অবস্থিত। কলকাতার উপকণ্ঠে যে সল্টলেক রাজারহাট অঞ্চল গড়ে উঠেছে তা অতীতে ছিল লেগুন (সামুদ্রিক জলের নোনা হ্রদ)। গঙ্গা থেকে পলি এনে এই জমি ভরাট করা হয়েছে। ফলে উপরে নিচে বালির মাঝে রয়েচে মোটা নদীজাত কাদামাটির স্তর। এই মাটির উপাদান ও গঠন ভূকম্পজাত তরঙ্গের প্রভাবে লিকুইফ্যাকশন হওয়ার জন্য আদর্শ। এর উপর গড়ে উঠেছে ভূমিকম্প প্রতিরোধের ক্ষমতাহীন সুবিশাল ও সুউচ্চ অট্টালিকার সারি। প্লেট সীমান্তে অগভীর এবং ৮ মাত্রার উপরে ভূমিকম্প হলে এবং নিকটবর্তী চ্যুতিগুলি সক্রিয় হয়ে ভূমিকম্পের জন্ম দিলে কলকাতা এবং তার উপনগরীগুলির ভয়াবহ দশা হতেই পারে।

অতীতে উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে অধিকাংশই কাঠের একতলা বা বড়জোর দোতলা বাড়ি দেখা যেত। বৈজ্ঞানিকভাবে এই ধরনের ঘরবাড়িগুলি ছিল ঐ অঞ্চলের জন্য আদর্শ। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং প্রধানত মুনাফার তাড়নায় ঐ শহরগুলিতে এবং প্রবল ভূমিকম্প প্রবণ দার্জিলিং, কার্শিয়াঙ শহরে এখন ভূমিকম্প প্রতিরোধক স্থাপত্য নীতিকে কাঁচকলা দেখিয়ে অসংখ্য সুউচ্চ অট্টালিকা গড়ে উঠেছে এবং হয়ে চলেছে। পুঁজির চাপের কাছে পৌরসভাগুলি নতিস্বীকার করে তার অনুমোদন দিয়ে নিজেরাও দুপয়সা পকেটে পুড়ছে। **এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। শহরের সমস্ত অট্টালিকা ও স্থাপত্যগুলির ও নিচের মাটির পুনরায় পরীক্ষা করে অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি স্থাপত্যগুলি ধ্বংস করা উচিত বাসিন্দাদের পুনর্বাসন ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে**। এই ধরনের সামাজিক আন্দোলন ও দাবি সর্বত্র তুলে ধরা উচিত।

ভূমিকম্প প্রতিরোধের কী কোনো উপায় নেই?

বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে প্রায় সমস্ত ভূবিজ্ঞানী, ভূপদার্থবিজ্ঞানী এবং ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণারত সংস্থাগুলি লাগাতার বলে চলেছে যে ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার মত ভূমিকম্পের কোনো আগাম পূর্বাভাস করা যায় না। এই প্রসঙ্গে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল জিওফিজিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর মত ভারতীয় গবেষণা সংস্থা, ইউনাইটেড স্টেট জিওলজিক্যাল সার্ভে অথবা জাপানী ভূমিকম্প গবেষণা কেন্দ্র সকলেই প্রায় একই কথা বলছেন। প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী কাগান (১৯৯৭) সালে বলেন যে ভূমিকম্পের মাত্রা, স্থান ও নির্দিষ্ট সময়কালকে আগে থেকে বলা যায় না। ভূমিকম্প সরলরৈখিক, আগাম নির্দিষ্ট নিয়মে হওয়া ও নির্ণয়যোগ্য ঘটনা নয়। এই সম্পর্কে পূর্বাভাস কখনও কখনও মিলে গেলে তা কাকতালীয়। জি এস আই-এর প্রাক্তন অধিকর্তা জ্ঞান রঞ্জন কয়ালও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। চীন-জাপান-রাশিয়া-কানাডা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারতসহ অধিকাংশ ভূবিজ্ঞানীই গত শতাব্দীর ৮ই দশক থেকে এই মত প্রচার করছে।

২০০১ সালে গুজরাতের ভূজের ভূমিকম্পের ঠিক পরেই মুম্বাইতে 'ইন্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডম' (ফ্রিডম পত্রিকা দ্বারা আয়োজিত) ভূমিকম্প নিয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। এই সভায় ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান এইচ এন শ্রীবাস্তব প্রস্তাব দেন যে অবিলম্বে ভারত সরকারের উচিত ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের জন্য গবেষকদের একটি প্যানেল গঠন করা। এই সভায় জি এস আই-এর প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর হেম্যাদি বলেন যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস নিয়ে জাপানের ব্যর্থতা (১৯৯৫)'র কথা। তিনি সরকারকে পরামর্শ দেন যে পূর্বাভাসের জন্য খরচ না করে সেই অর্থ ভূমিকম্প প্রতিরোধক স্থাপত্য বিজ্ঞানের গবেষণায় এবং ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজে বা ত্রাণের কাজে ব্যয় করা উচিত। (সূত্র ঃ আর্থকোয়েকস – এ কে আর হেম্যাদি)

বর্তমানে ভারত সরকার সহ বিশ্বের সব রাষ্ট্রই এই নীতি অনুসারে চলছে এবং প্রকৃতির কাছে মানুষ অসহায়, তাই নিয়ে না ভেবে ভূমিকম্প প্রতিরোধক স্থাপত্য বিজ্ঞান নিয়ে এবং ধ্বংসের পর মানুষ উদ্ধার এবং পুনরায় স্থাপত্য নির্মাণের জন্য ডিসাসটার ম্যানেজমেন্ট গড়া হয়েছে। এতে বিশ্বের মালিকশ্রেণী খুশী। পূর্বাভাস করে মানুষ ও জীবজন্তু বাঁচাবার ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করলে রিটার্নের কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু ভূমিকম্প প্রতিরোধক স্থাপত্য গঠনের কাজে বিশেষ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর পুনর্নির্মাণের কাজে বিনিয়োগ খুবই মুনাফাদায়ী বলে এই প্রকল্পে মালিকশ্রেণী খুবই উৎসাহী।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কি সত্যিই অসম্ভব?

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে ভূমিকম্প কোনো

অপ্রাকৃতিক এবং আকস্মিক ঘটনা নয়। একটা প্রাকৃতিক নিয়ম মেনেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ত ঘটে চলেছে।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে, প্লেট টেকটনিক তত্ত্বের আবিষ্কারের অনেক আগেই ভূবিজ্ঞানী হ্যারি রীড বলেন যে চ্যুতিতল বরাবর দুই প্রস্তরখন্ডের পীড়নের মাত্রা এবং যে উপাদান দিয়ে প্রস্তরখন্ডগুলি গঠিত তার সঠিক হিসাব নিকাশ করতে পারলে বলা সম্ভব হবে যে কখন পীড়নের মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে চ্যুতি ঘটাবে এবং ভূমিকম্প ঘটবে। এটা করা সম্ভব হলেই ভূমিকম্পের সঠিক স্থান ও সময় সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস করা সম্ভব হবে। ১৯৪৯ সালে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের গার্ম অঞ্চলে ভূমিকম্পের ফলে বরফের ধস বহু মানুষের মৃত্যু ঘটায়। এরপর থেকেই সে দেশে ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পূর্বাভাস সম্পর্কে ডাইলেটেনসি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন যা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রয়োগ করে বেশ কিছু সাফল্য উঠে আসে। এই তত্ত্বের মূল কথা হল – ভূমিকম্পের কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ বা মাসাধিককাল আগে 'পি' এবং 'এস' তরঙ্গের গতিবেগের পার্থক্য বেড়ে যায় যাকে বলা হয় লিড টাইম। আবার বড় ভূমিকম্পের কিছু আগে তরঙ্গের গতিবেগ (স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় পি ওয়েভ-এর গতিবেগ এস ওয়েভের দ্বিগুণ) স্বাভাবিক হয়ে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ানক ভূমিকম্প প্রবণ ক্যালিফোর্নিয়ায় এই তত্ত্বের প্রয়োগ করে ভাল সাফল্য পাওয়া যায়। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান অ্যান্ড্রিয়াস ফল্ট এলাকার হোলিস্টার অঞ্চলে পূর্বাভাসের পরদিনই ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। জাপানের উত্তরাঞ্চলে ১৯০৪ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যকার সময়ের ১২টি বড় ভূমিকম্পের তথ্য নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানী ফ্যাতভ প্রতিটি বড় ভূমিকম্পের মধ্যকার অবস্থানগত 'সিসমিক গ্যাপ' চিহ্নিত করেন। ফ্যাতভ এই গবেষণার ভিত্তিতে পূর্বাভাস করার পদ্ধতির কথা বলেন। এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত স্যান অ্যান্ড্রিয়াস ফল্ট, মালয়েশিয়া, আলাস্কা, জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপপুঞ্জ, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের কামচাটকা, মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূল, পেরুর চিকোয়াইন প্রভৃতি অঞ্চলে আগাম পূর্বাভাস সফল হয়েছিল তবে সরকারি উদাসীনতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণকে বিপজ্জনক অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ না হওয়ায় তাদের মৃত্যু ঠেকানো যায় নি।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস নিয়ে গবেষণার কাজে তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চীন সবচেয়ে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৬৬ সালে সেদেশে সিংতাই ভূমিকম্পের পর সরকার ভূমিকম্প পূর্বাভাসের জাতীয় কর্মসূচী ঘোষণা করে। চীনা রাষ্ট্রীয় সিসমোলজিক্যাল ব্যুরো চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলের লাওলিং প্রদেশকে ভবিষ্যতের উচ্চ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও তাদের সহযোগীদের এবং কমিউনের সাধারণ জনতাকে শিক্ষিত করে মাটি ও পাথরের নিয়মিত ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন, মাটিতে বসবাসকারী সরীসৃপ ও অন্যান্য জীবজন্তু এবং পাখিদের আচরণের উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি, কূয়োর জল, পাহাড়ের ধস পরীক্ষা করা হয় লাগাতারভাবে নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে। এই গবেষণার ফলগুলিকে বিশ্লেষণ করে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে এক বড় ভূমিকম্পের স্বল্পকালীন পূর্বাভাস করা হয় (কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঘটবে)। এই পূর্বাভাসের পর অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক মানুষ, গবাদি পশুকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ ৭.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। কিছু সম্পত্তি ধ্বংস হলেও কোনো প্রাণহানীর ঘটনা ঘটেনি। এইভাবে চীনে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৬-এর প্রথম পর্যায় পর্যন্ত ৪টি বড় ভূমিকম্পের সফল পূর্বাভাস বহু মানুষের জীবন বাঁচায়। কিন্তু ১৯৭৬ সালের ২৮শে জুলাই তাসাং অঞ্চলে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস না করতে পারায় ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮০০ মানুষ নিহত হন।

১৯৭৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভূমিকম্প বিশারদ দলের একটি টীম চীনের ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা প্রত্যক্ষ করতে যান। মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক প্রেস বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেন "ওদেশে ১০,০০০ শিক্ষিত ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ১৭টি নোডাল কেন্দ্রে ২৫০টি সিসমিক স্টেশনে ৫০০০ টি অবজারভেশনাল পয়েন্ট থেকে নিরন্তর সিসমিক ডেটা, পদার্থের ভৌত-রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন লক্ষ্য করে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন গৃহপালিত ও বন্য প্রাণীর অস্বাভাবিক আচরণ নজর করে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের সহযোগিতায়।" এই গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৭৪-এর নভেম্বরে ক্যালিফোর্নিয়া ভূমিকম্পের পূর্বাভাস করেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। চীনের সাফল্য জাপানের বিজ্ঞানীদেরও অনুপ্রাণিত করে। ১৯৭৮ সালে সাধারণ মানুষের দাবি মেনে জাপান সরকার ভূমিকম্প পূর্বাভাস নিয়ে আইন পাশ করে। 'ভূমিকম্প পূর্বাভাস কাউন্সিল' গঠন করা হয়। এই কাউন্সিলের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে ১৯৮৩ সালে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের ১২ দিন আগে সফল পূর্বাভাস করা সম্ভব হয়েছিল। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, স্কুল কলেজ বন্ধ রেখে মানুষকে বিপজ্জনক অঞ্চল থেকে সরিয়ে বাঁচানো গেছিল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার মত ঘটনা হল এই

যে এতবড় সাফল্যকে জাপান সরকার প্রচারের আলোয় নিয়েই আসেনি। উল্টে সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে যে এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে সরকারের ৭০০০ মিলিয়ন ইয়েন খরচ হয়ে গেছে। ভূমিকম্পে ঘর-বাড়ি ধ্বংস হওয়ায় যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার তুলনায় পূর্বাভাস বাবদ খরচ নাকি অনেক বেশি! ১৯৯৫ সালে জাপানের কোবে ভূমিকম্পে কোনো পূর্বাভাস ছিল না এবং এতে ৬৪০০ জন মারা যান। এরপর 'জিওডেসি কাউন্সিল অফ জাপানস মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন' পূর্বাভাস করার জন্য খরচ করাকে অর্থহীন বলে প্রতিপন্ন করে এবং এই গবেষণা বন্ধ করার প্রস্তাব দেয়। বলা হয় "গত ৩০ বছর আমাদের পূর্বাভাস বাবদ ১৬০ বিলিয়ন ইয়েন খরচ হয়েছে। এই বিনিয়োগ অর্থহীন। বরং গবেষণাকে ভূমিকম্প প্রতিরোধক স্ট্রাকচার গড়ার ক্ষেত্রে ব্যয় করার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার।"

এরপর থেকে বিশ্বের সব রাষ্ট্রই এই নীতি অনুসারে চলছে। বিজ্ঞানীরা এবং জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থাগুলি লাগাতার প্রচার করছে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস করা যায় না। অতীতে যেসব পূর্বাভাস হয়েছিল সেগুলি কাকতালীয়!

বিজ্ঞান মনস্ক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ

এখন খোলা মনে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ বর্তমান পর্যায়ে এসে বিজ্ঞান ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে বহুলাংশেই জানতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বে ভূমিকম্পের সকল কেন্দ্রস্থলগুলি (মহাদেশ বা সাগরে) সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে। নতুন নতুন চ্যুতিতলের জন্ম, তাদের বিস্তারকে নিয়মিত সুনির্দিষ্ট করছে ফলে ভূমিকম্পের আগামী কেন্দ্রস্থলগুলিও প্রায় জানা আছে।

দ্বিতীয়তঃ ভূমিকম্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল প্লেট সীমান্ত এবং অন্যান্য চ্যুতিতলগুলিকে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে, আধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি চ্যুতিতলের দুইপাশের ফল্ট ব্লকগুলির প্রতি মুহূর্তের সরণের হার (গতিবেগ তথা তার নিয়ত পরিবর্তন) মাপতে পারছে।

তৃতীয়তঃ ফল্ট ব্লকগুলিতে পীড়নের মাত্রা কতটা সৃষ্টি হচ্ছে তার খুঁটিনাটি হিসাব করার ক্ষেত্রে বর্তমানে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে মহাদেশীয় ভূত্বকে পদার্থের উপাদান ও গঠন সামুদ্রিক ভূত্বকের তুলনায় অনেক জটিল বলে পীড়নের স্থিতিস্থাপক সীমা নির্ণয় করা যথেষ্ট কঠিন এবং এখনও পর্যন্ত সফলভাবে সবসময় করা যাচ্ছে না। তাছাড়া প্লেটের গতিবেগ (মান ও দিক) বার বার পরিবর্তন হয়। এর কারণ এখন অজ্ঞাত। এর ফলে পীড়নের মাত্রা কত এবং কখন বা ঠিক কোন মুহূর্তে তা স্থিতিস্থাপক সীমা অতিক্রম করবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এর জন্য যে পরিমাণ আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ ও কর্মীর প্রয়োজন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। রাষ্ট্র ও বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণার কোম্পানিগুলি এই গবেষণায় বিনিয়োগে অরাজী কারণ তাদের কাছে তা মুনাফাদায়ী নয়। বরং ভূমিকম্প প্রতিরোধক স্থাপত্য নির্মাণে এবং ভূমিকম্প পরবর্তীতে শহর পুনর্গঠন অনেক মুনাফাদায়ী বলে লোভনীয়।

চতুর্থতঃ শুধুমাত্র ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলিতেই এই গবেষণা চালালে হয় না। সাধারণভাবে প্লেট সীমান্ত অঞ্চলে বা অন্যত্র সক্রিয় চ্যুতিতল অঞ্চলে এই গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখলে চলে না। বড় মাত্রার এবং কম গভীরতার ভূমিকম্পের ফলে ভূকম্পজাত তরঙ্গ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তার প্রভাবে (সিসমিক এনার্জি) অন্য অঞ্চলও কম্পিত হয়। এই কম্পন সেইসব অঞ্চলের পাথর-মাটি এবং তার উপর স্থাপিত স্থাপত্যকেও কম্পিত করে। ওইসব অঞ্চলে ভূমিকম্পের কি কি প্রভাব পড়তে পারে (ল্যান্ড স্লাইড, লিকুইফ্যাকশন ইত্যাদি) নিয়মিত তার গবেষণাও প্রয়োজন। যা বাস্তবত তেমনভাবে করা হয় নি।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ভূমিকম্প ও তার কারণকে অনেকটাই জানতে পেরেছে। দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস (কিছু বছর বা কিছু মাসের মধ্যে ভূমিকম্প হবে) করা এখন বিজ্ঞানের পক্ষে সহজ। কিন্তু স্বল্প মেয়াদি পূর্বাভাস (কয়েকদিন বা সপ্তাহের মধ্যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস) করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এখনও শেষ কথা বলার স্তরে যায় নি। নিরন্তর গবেষণায় কয়েকটি ক্ষেত্রে তাকে নির্দিষ্ট করা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা করা যায় নি। আর বিগত কয়েক দশক তার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এটাকে অসম্ভব প্রমাণ করার লাগাতার প্রয়াস চলছে।

মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত সমাজ তাই গবেষণা তথা প্রকৃতিকে জয় করার কাজ করতে উৎসাহী নয় বরং তাকে বাধাদানই তার নীতি। এর কারণ দুটি –

১) এই গবেষণায় বিনিয়োজিত অর্থ মুনাফা হয়ে ফিরে আসে না।

২) পূর্বাভাস অসম্ভব, মানুষের পক্ষে কখনওই তা করা সম্ভব নয় এই প্রচার প্রকৃতির নিয়মকে তথা অজানাকে জানার অদম্য প্রয়াসকে দুর্বল করে। প্রাকৃতিক ঘটনাকে অতীন্দ্রিয় শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে – এটা জানার চেষ্টা বৃথা, প্রকৃতিকে জানার চেষ্টা না করে

প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মেনে নেওয়ার দর্শন জনমানসে প্রভাব সৃষ্টি করে। সমাজে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের পরিবর্তে ভাববাদের প্রচার প্রসার বাড়ে। অন্ধত্ব এবং অলৌকিকতাবাদের প্রসার লাভ ঘটায়। সুতরাং এই প্রচার শাসকশ্রেণীর হাত শক্তিশালী করে।

ভূমিকম্প প্রতিরোধক স্থাপত্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা

এর প্রয়োজনীয়তা বা বিকাশের বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। ভূমিকম্পের বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এই প্রযুক্তির বিরাট উন্নতি হয়েছে। প্রধানতঃ দুটি পদ্ধতি বিজ্ঞানীরা অনুমোদন করেন –

১) প্রবল ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে জনসংখ্যা তুলনামূলক কম হলে অথবা কম বিকশিত অঞ্চল হলে – ঘরবাড়ি হাল্কা পদার্থ দিয়ে (কাঠ বা প্লাস্টিক) তৈরি করতে বলা হয়, যাতে ভূমিকম্পে ঘর ভেঙে প্রাণহানী না হয়।

২) অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ভূমিকম্প প্রতিরোধক বিশাল স্থাপত্য গঠন করে বিরাট সাফল্য পাওয়া গেছে বহু উন্নত দেশে বিশেষত জাপানে।

কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এই প্রযুক্তি গ্রহণের বিরাট প্রচার হলেও তার প্রয়োগ আমরা এদেশে বাস্তবে দেখতে পাই না। পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য সব রাজ্যেই পৌরসভাগুলিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্থাপত্য আইন ভেঙে ঘরবাড়ি, ব্রীজ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে।

এর বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে গণ আন্দোলন প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দাবি আগেই রাখা হয়েছে।

ভূমিকম্প কি আদৌ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?

বিজ্ঞান ভূমিকম্পের কারণ জেনেছে। বিজ্ঞানীদের একাংশ কল্পনা করতে শুরু করেন যে চ্যুতিতলে যে পীড়ন সৃষ্টি হচ্ছে তাকে যদি নিয়ন্ত্রতভাবে ও পর্যায়ক্রমে কৃত্রিম ভূকম্প ঘটিয়ে গতিশক্তির আকারে নির্গমণের ব্যবস্থা করা যায় তবে একটা ভূমিকম্পকে অসংখ্য ছোট ছোট ভূমিকম্পে ভাগ করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে প্রমাণ করে দেখেছেন যে জল বা অন্য কোন পিচ্ছিল (Lubricant) পদার্থ যদি চ্যুতিতল বরাবর মাটির অনেক গভীরে উচ্চচাপের দ্বারা প্রবেশ করানো যায় তবে সেই তরল চ্যুতিতল বরাবর নেমে চ্যুতিতলে সেই সময় যে পীড়ন সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে উদ্ভুত শক্তি নিগর্ত হয়ে চ্যুতি ঘটাবে এবং তাতে ছোট মাত্রার ভূমিকম্প হবে। এইভাবে প্রায় ৫০-৬০ বছর যে বড় ভূমিকম্প হয়, প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয় তাতে এই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ও পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট অসংখ্য ভূমিকম্পে ভাগ করে দেওয়া যায়। সিসমোলজিস্টরা তত্ত্বগতভাবে দেখিয়েছেন যে একটা ৬ মাত্রার ভূমিকম্পকে এইভাবে ৩২টি ৫ মাত্রার, ১০০০ টি ৪ মাত্রার এবং ৩২,০০০ টি ৩ মাত্রার ভূমিকম্পে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব। প্রাকৃতিকভাবে চ্যুতিতলের উপর স্থাপিত এলাকায় থেকে তরল চ্যুতিতলে প্রবেশ করায় কয়েকটি ভূমিকম্প হয়েছে যেমন গুজরাটের কয়না, নার্গাজুন সাগর এবং হীরাকুদ বাঁধ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেকিস্তানে এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের বড় অংশ একে কাল্পনিক এবং অনৈতিক মনে করেন। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধতার অভিযোগ এনে এই কাজকে কার্যত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় যেহেতু পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন তাই একে কোন রাষ্ট্রই অনুমোদন দেয় না।

উপসংহার

সমগ্র আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ভূমিকম্পের বিজ্ঞান মানুষ অনেকাংশেই জানতে পেরেছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলি চিহ্নিত করতে পেরেছে, ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের বিজ্ঞানও মানুষের জানা হয়ে গেছে তবে তাকে সফলভাবে প্রয়োগ করতে গেলে চাই আন্তর্জাতিক আইন। চাই অসংখ্য বিজ্ঞানীদের লাগাতার নিরলস ভূমিকা, চাই জনতাকে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলা। এই কাজে চাই বিপুল প্রযুক্তির ব্যবহার, চাই বিপুল বিনিয়োগের যা কোন মুনাফা দেবে না মানুষের কল্যাণ করবে। ভূমিকম্পের প্রতিরোধের স্থাপত্য বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতি হয়েছে। আরও উন্নতি এবং তার বাধ্যতামূলক প্রয়োগ প্রয়োজন। এই বিষয়ে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। ভূমিকম্পকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রাথমিক বিজ্ঞান মানুষ জানতে পেরেছে কিন্তু এর প্রয়োগে রাষ্ট্রগুলির কোন সায় নেই।

শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভূমিকম্প প্রতিরোধের জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানবজাতির সংগ্রাম তাই রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই সুযোগে প্রকৃতির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসর্মপণের কথা বলা হচ্ছে। আসুন বিজ্ঞান মনস্ক মন নিয়ে সমগ্র বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করি। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে প্রকৃতিকে জানা এবং সমস্যার সমাধানের জন্য জোটবদ্ধ হয়ে ব্যবস্থার মালিকদের কাছে সোচ্চার হই। নেপাল ভূমিকম্প এবং অতীতের অসংখ্য ভূমিকম্পে যাদের জীবন গেছে, তাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক ভূমিকম্প সম্পর্কে তার মতামত পাঠকদের কাছে পেশ করলে। পাঠকরাই বিষয়টি বিবেচনা করবেন।■

সমাজ দর্পণ

গোমূত্র এবং গোবর কি সর্বরোগহরা? গোমূত্র থেকে প্রস্তুত ‘গোনাইল’ প্রচলনের উদ্দেশ্য কী?

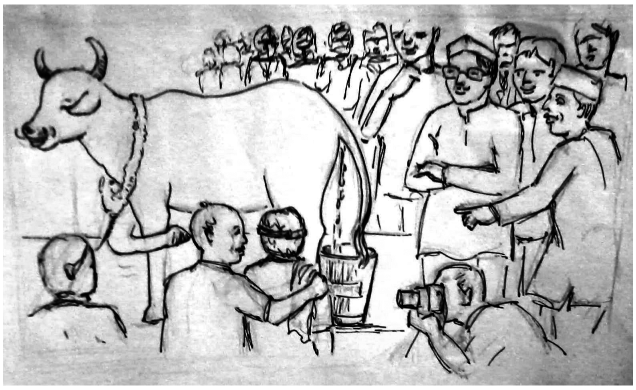

শিল্পী ঃ রত্না হাজরা

কেন্দ্রের নারী ও শিশু বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গাঁধী ২০১৫ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে সকল সরকারি দপ্তরের (মেঝে এবং টয়লেট) পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহৃত ফিনাইলের বদলে গোমূত্র থেকে প্রস্তুত ‘গোনাইল’ ব্যবহার করার আর্জি পেশ করেছেন। তিনি এক চিঠিতে মন্ত্রীসভার অন্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন “আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যে আপনাদের মন্ত্রকের অফিসগুলিতে বর্তমানে ব্যবহৃত ফিনাইলে বদলে গোনাইল ব্যবহার করুন। কারণ ফিনাইলের উপস্থিতি রাসায়নিক পরিবেশের পক্ষে খারাপ। আর গোমূত্র থেকে প্রস্তুত গোনাইল পরিবেশ বান্ধব।” এই গোনাইল প্রস্তুত করা হচ্ছে গোমূত্রের সাথে নিমগাছের নির্যাস এবং পাইনের সুগন্ধ মিশিয়ে। সমস্ত কেন্দ্রীয় দপ্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্য অবিলম্বে এই গোনাইল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব আসছে। এই গোনাইল সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ‘হোলি কাউ ফাউন্ডেশন’ নামক একটি এনজিও’কে এবং তা প্রস্তুত করবে ‘কেন্দ্রীয় ভান্ডার’ নামক একটি সরকারি কোঅপারেটিভ সংস্থা। কেন্দ্রীয় ভান্ডারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জগদীশ ভাটিয়া বলেন “এটা একটা মহান পণ্য যা সমস্ত সাফাইকর্মী এবং গরুর স্বাস্থ্য উন্নত করবে।” কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গাঁধী বলেন “আমাদের সামনে এক বিরাট সুযোগ উপস্থিত – বিষাক্ত রাসায়নিকের বদলে গোনাইলের ব্যবহার গোমাতার মূল্য সমাজে আরও বাড়িয়ে দেবে।”

‘হোলি কাউ ফাউন্ডেশন’-এর প্রধান শ্রীমতী অনুরাধা মোদি বলেন যে গোনাইলের জীবাণু নাশক এবং ছত্রাক নাশক (অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল অ্যান্ড অ্যান্টি ফাঙ্গাল) গুণাগুণ আছে যা ‘গরুকে বাঁচাবে এবং জাতির সেবায় লাগবে’। তিনি দেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন গোশালায় গিয়ে গোনাইল যাতে ‘সবচেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিকভাবে’ প্রস্তুত করা যায় তার তদারকি করছেন। হোলি কাউ ফাউন্ডেশন প্রাথমিকভাবে গোনাইল প্রস্তুত করছে উত্তর প্রদেশের মথুরার নিকটস্থ বারসানাতে। সেন্টার ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, আইআইটি দিল্লীর অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার বিজয় মন্তব্য করেছেন যে এই গোনাইল যেহেতু ফিনাইলের মত তীব্র নয় এবং তাতে কোন খারাপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং এটা জৈব যৌগ তাই এই পণ্য ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত ভাল। তিনি ইকনমিক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (৯ই জানুয়ারি ২০১৫) বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ নিচ্ছে এমন নয়। তিনি বলেন “২০০৪ সালে সরকার প্রখ্যাত গবেষণা কেন্দ্রের কর্মীদের নিয়োগ করেছিল গরুর বর্জ্য পদার্থের সংক্রমণ বিরোধী গুণাগুণ বিচারের জন্য। কিন্তু গবেষকরা সিদ্ধান্তমূলক জায়গায় পৌঁছবার আগেই গবেষণা বন্ধ করে দেওয়া হয়।” তিনি আরও বলেন যে “যদিও প্রাথমিক গবেষণা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে গোমূত্র ফিনাইলের ভাল বিকল্প হতে পারে যদি তার সাথে সঠিক ভেষজ নির্যাস সঠিক পরিমাণে মিশ্রিত করা যায় এবং তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করা হয়।” হোলি কাউ ফাউন্ডেশনের প্রধান শ্রীমতী অনুরাধা মোদি আরও এককাঠি উপরে উঠে মন্তব্য করেন যে গোনাইলের কর্মক্ষমতা পরীক্ষার দ্বারা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। তিনি ইকনমিক টাইমসকে গত ৯ই জানুয়ারি বলেন “এই পণ্যের কীটনাশকের গুণাগুণ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পরীক্ষাগার থেকে ‘অসাধারণ’ শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) দেওয়া হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই এই শংসাপত্র সরকারের কাছে জমা দিয়েছি এবং সরকার তা অনুমোদনও করেছে। ... এই সিদ্ধান্ত গোশালাগুলিতে গোমূত্র পরীক্ষা, সংরক্ষণ ও শোধন

করার যন্ত্রপাতি যোগানের ব্যবস্থা করবে যাতে মূল্যবান গোবর্জ্যগুলি বিশুদ্ধ করে তা ব্যবহার্য করতে পারি।"

মেইল অন লাইন ইন্ডিয়া, ৪ঠা মে ২০১৫ জানাচ্ছে যে বিজেপি শাসিত রাজস্থান সরকার রাজ্যের অন্তর্গত হাসপাতালগুলিতে অতি শীঘ্রই পরিচ্ছন্নতার জন্য কম বিষাক্ত গোমূত্র ব্যবহার করবে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গাঁধীর দেখানো পথেই রাজস্থান সরকার গোমূত্র দিয়ে হাসপাতালগুলি পরিচ্ছন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোমূত্র থেকে প্রস্তুত 'গোনাইল' প্রথমে ব্যবহার করা হবে জয়পুরের সাওয়াই মান সিং (এস এম এস) হাসপাতালে, যা রাজ্যের প্রথম সারির মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেন্দ্র রাঠোর সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন "যদি এস এম এস হাসপাতালে এর প্রয়োগ সফল হয় তবে রাজ্যের সকল হাসপাতালেই এর প্রয়োগ হবে।" তিনি সংবাদ সংস্থার কাছে এই ঘোষণা করেছেন যখন জালোর জেলার সানচোর শহরের নিকটস্থ পথমেদা গ্রামে গোমূত্র পরিশোধন কেন্দ্র উদ্বোধন করছিলেন। 'পার্থভিমেদা গো ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড' কোম্পানির এই গোমূত্র পরিশোধন কেন্দ্র তৈরী করা হচ্ছে চার কোটি টাকা ব্যয় করে ২৫০ একর জমির উপর গোপাল-গোবর্ধন গোশালা কেন্দ্রে। এই কোম্পানি গরুর দুধ এবং গোমূত্র থেকে তৈরি পণ্য তৈরি করে বড় অঞ্চলে তার বাজারের বিস্তার ঘটিয়েছে। এই গোশালার বরিষ্ঠ আধিকারিক বৈদ্য শ্যাম সিং রাজপুরোহিত সংবাদ সংস্থাকে বলেন যে তাদের শোধনাগারে প্রতিদিন ৭০০০ লিটার গোমূত্র শোধন করা যাবে যার ৫০ শতাংশ বাজারজাত করা হবে।

এই গোনাইলের প্রস্তুতিকরণ এবং কতটা উপযোগী তা পরীক্ষার জন্য রাজস্থান সরকার ডাক্তারদের একটা টীম গঠন করেছে যারা পর্যবেক্ষণ করবেন বিষয়টা এবং যোধপুরের আয়ুর্বেদিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিকানিরের ভেটেরেনারি বিশ্ববিদ্যালয়কে এর উপর গবেষণা করে রিপোর্ট দিতে বলেছে। রাজস্থানের বিরোধী দল কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের কোনো বিরোধিতা না করে বলেছে যে সরকারের উচিত রাজ্যবাসীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানভাবে মনযোগ দেওয়া। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতা লাল চাঁদ যোশী বলেছেন "সবশেষে আমাদের গোমাতার ঐশ্বরিক ক্ষমতার কথা বিচার করতে হবে, কারণ গোমাতা আমাদের সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।"

গোমাতার মাহাত্ম!

এখন প্রশ্ন হল গরুর বর্জ্য পদার্থ সর্বরোগহরা, পবিত্রতার প্রতীক এবং ঈশ্বরের প্রসাদতুল্য এবং পরিবেশবান্ধব বলে এত প্রচার হচ্ছে কেন? কেন্দ্র সরকার তার সকল সরকারি দপ্তরে এবং রাজস্থান সরকার সকল সরকারি হাসপাতালে এর ব্যবহার চালু করছে কেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তরে যাওয়ার আগে গোমাতার মাহাত্ম নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারের দিকে চোখ বোলানো যাক।

হিন্দুত্ববাদীরা বহুকাল ধরেই বলে আসছে গরু হল সমগ্র মানব সমাজের মাতা তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাতা, ঈশ্বস্বরূপিনী। তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করা উচিত। গরুর শরীর থেকে ক্ষরিত এবং রেচন পদার্থ হিসাবে নিষ্কাশিত পদার্থগুলিকে বলা হয় 'পঞ্চগব্য'। এই পঞ্চগব্য হল গরুর মল বা গোবর, গোমূত্র, দুধ, ঘি এবং দই। বলা হচ্ছে যে গোমূত্র (গৌমূত্র আসভ বা জারিত গোমূত্র), গৌ-অর্ক (পরিশোধিত গোমূত্র) এবং গনাবতী (গোমূত্র থেকে প্রস্তুত ট্যাবেলট) হল ওষধি যার দ্বারা নাকি সাধারণ জ্বর থেকে ক্যানসারের মত শতাধিক রোগের নিরাময় সম্ভব। পঞ্চগব্য নাকি মানুষের শরীর ও মনকে শুদ্ধ করে। কোন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে পঞ্চগব্য ব্যবহার হল আবশ্যিক। গোবর্জ্য শুধু মানুষের উপকারে আসে তা নয়, তাকে কীটনাশক এবং সার হিসেবে চাষের জমিতে ব্যবহার করা যায়। অতি সম্প্রতি পঞ্চগব্যকে চিকুনগুনিয়া অসুখেরও ওষধি হিসাবে দাবি করা হচ্ছে। শুধু 'গোনাইল' নয়, গোমূত্র থেকে মাথায় মাখার তেল, শ্যাম্পু, ত্বকের ক্রিম প্রস্তুত করা হয়। সাবান, নাসিকায় ব্যবহার্য পাউডার, বডি পাউডার, বডি ক্রিম, ধূপকাঠি, দাঁতের মাজন প্রভৃতি তৈরি হয় গোবর থেকে। দাবি করা হয়েছে অসংকর (পিওর ব্রিড কাউ) গোরুর বর্জ্য পদার্থের নাকি ৯০ থেকে ৯৮ শতাংশ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। আর সংকর গরুর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ৪০ শতাংশেরও কম।

এই দাবিগুলির ভিত্তি কি? এর প্রধান ভিত্তি হিসাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত 'চরক সংহিতা', তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত 'শুশ্রূত' এবং ৭ম শতাব্দীতে রচিত 'ভাগবৎ'-এ উল্লিখিত কিছু শ্লোককে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। চরক সংহিতায় গরুর রেচন পদার্থের মাহাত্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঃ

১) গরু আমাদের মাতা এবং আমরা তাঁর সন্তান। সুতরাং গোমূত্র আমাদের পক্ষে উপকারী।

২) শরীরে কোনো অসুখের কারণ হল পিত্তরস, শ্লেস্মা এবং

বায়ুতে কিছু মৌলের ভারসাম্যের অভাবে। গোমূত্র সেই মৌলগুলির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে।

৩) জীবজগতের সকলের মূত্রের মধ্যে গোমূত্রই শ্রেষ্ঠ।

৪) গোমূত্রের মধ্যে স্বয়ং মা গঙ্গা অবস্থান করেন এবং গোমূত্রে তামা এবং সোনার লবণ আছে। গোমূত্র এমন পদার্থ যা যেকোনো ধাতুর সংস্পর্শে এসে তাকে সোনায় পরিণত করার ক্ষমতা রাখে। গোমূত্রের ক্ষয় হয় না, তার গুণাগুণ নষ্ট হয় না। গোমূত্র যত পুরানো হয় ততই তা ব্যবহারের উপযোগী হয়।

'শুশ্রুত' এবং 'ভাগবৎ' কাব্যে বলা আছে গোমূত্র এবং গোবরে কোনো বিষাক্ত পদার্থ নেই। এর ব্যবহারে সব অসুখ নির্মূল হয়। এর কারণে হিন্দুত্ববাদীরা প্রচার করে জগতের মাতা গরু অবশ্য পূজনীয়। একে হত্যা করা বা গোমাংস ভক্ষণ অপরাধ। এই অপরাধ করলে নরকযাত্রা নিশ্চিত। শুধু তাই নয় গোহত্যাকারী বা গোমাংস ভক্ষণকারী শুদ্রশ্রেণীর মানুষ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমানদের হত্যা করা অপরাধ নয় পূণ্যকর্ম। ইহজগতে কোনো পাপ কাজ করলে পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান আছে সেই প্রায়শ্চিত্ত করার সময় গোবর ও গোমূত্র সেবন অপরিহার্য। অন্য ধর্ম থেকে হিন্দু হতেও যে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান আছে তাতেও গোবর ও গোমূত্র সেবন আবশ্যিক।

গো মাহাত্ম প্রচারে ছদ্মবিজ্ঞানের প্রয়োগ

একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে শুধু এইসব পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণায় সন্তুষ্ট করা যায় না। তাই ওইসব পৌরাণিক কাহিনীর যথার্থতা প্রমাণে 'তথাকথিত বিজ্ঞানীদের' বাজারে নামানো হয়েছে। এই প্রচার হিন্দুত্বাবাদী বিজেপি'র কেন্দ্র বা রাজস্থান রাজ্য সরকার এবছরই প্রথম করল এমন নয়। মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীর মত কট্টর হিন্দুত্ববাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, নানা সাধু সন্ত এবং পয়সার বিনিময়ে বিক্রি হওয়া তথাকথিত খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, নানা এনজিও এই প্রচার করছে দীর্ঘ্যকাল যাবত। ২০০৪ সালেই কেন্দ্র সরকার গোমূত্রের বিশুদ্ধতা নিয়ে ছদ্ম গবেষণা শুরু করেছিল। নানা বিরোধিতায় সেই সময় সেই গবেষণা বন্ধ হলেও সেই সময়কার তথাকথিত গবেষকদের দ্বারা প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলিকে হাতিয়ার করছে হিন্দুত্ববাদীরা। এইসব গবেষকদের রচিত গবেষণাপত্রগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল – অ্যানালাইসিস অফ কাউস ইউরিন ফর ডিটেকশন অফ লাইপেস অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল প্রপার্টিস – সানিশ কুমার; পঞ্চগব্য (কাউপ্যাথি) কে. ধামা, আর রাঠোর, আর এস চৌহান, এস তোমার; ম্যাজিক্যাল থেরাপি–কাউ ইউরিন – এইচ ভাদুরি; পঞ্চগব্য থেরাপি – আর এস চৌহান ইত্যাদি।

এই সকল গবেষণাপত্রগুলিই হল বস্তুবাদী দর্শন বিরোধী, ভিত্তিহীন, মনোগত, চাতুরিপূর্ণ এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রচিত। যা বৈজ্ঞানিক মহল কখনই মান্যতা দেয় না।

বিজ্ঞান কী বলে?

গরু হল একপ্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী – মহিষ, ঘোড়া, ইঁদুর, বাঁদর, হাতি, বাঘ, ছাগল, ভেড়া, মানুষের মত। এই সকল প্রাণীদের মূত্র (ইউরিন) হল তাদের শরীরের কিডনি (বৃক্ক) দ্বারা পরিশ্রুত একধরণের তরল বর্জ্য পদার্থ এবং তার রেচন হয় ইউরিনারি সিস্টেম বা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই মূত্রে থাকে নানা দ্রবীভূত যৌগ, জৈবনিক (বায়োলজিক্যাল) পদার্থ বা জীবিত শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় বলেই তা শরীর থেকে নিষ্কাশিত হয় মূত্রনালী দ্বারা। মূত্রে শরীরের অপ্রয়োজনীয় রেচন পদার্থগুলিতে এমন অনেক পদার্থ থাকে যা ওই রেচন পদার্থগুলির নিষ্কাশনে বড় ভূমিকা নেয়। রাসায়নিক উপাদান হিসেবে মানুষের মূত্রের সাথে অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মূত্রের বিশেষ কোনো ফারাক থাকে না, খাদ্যাভ্যাসের কারণে উপাদানগুলির অনুপাতের হারের কিছু ফারাক ছাড়া।

বিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু ব্রিসটো, ডেভিড হোয়াটহেড, জন ই ককবার্ন তাঁদের প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে (জার্নাল অফ সায়েন্স ফর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার) ১০টি গরু, ৫টি ভেড়া এবং ৪টি ছাগলের মূত্রের নমুনা নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এইসব মূত্রগুলিতে থাকা রাসায়নিকগুলির মূল উপাদান হল – জল এবং নানা নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ, কিছু এনজাইম এবং অন্যান্য জীবাণু। এই নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগগুলি হল ইউরিয়া, অলানটয়েন, হিপপিউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, ক্রিয়েটিন, ইউরিক অ্যাসিড, জ্যানথাইন, হাইপোজ্যানথাইন, মুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়া। গরু-ছাগল ও ভেড়ার মূত্রে এই উপাদানগুলির হার অল্পবিস্তর ভিন্ন। মানুষ এবং গরুর মূত্রে ইউরোকাইনেস বলে একপ্রকার এনজাইম পাওয়া যায় যা মূত্রকে জমাট বাধতে বাধা দেয়। মানুষের মূত্র থেকে এই এনজাইম পৃথক করে তাকে ধমনীতে রক্ত জমাট বাধা রুখতে ব্যবহার করা হয়। তাই বলে প্রত্যেক মানুষ যদি স্বমূত্র পান করেন তবে তার ধমনীতে রক্ত জমাট বাধা রোধ হয় না। বিজ্ঞানীরা তাই হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচতে

স্বমূত্র পান করার পরামর্শ দেন না। কারণ এতে হিতে বিপরীত হয়। মানুষ, গরু প্রভৃতি প্রত্যেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর মূত্রে যে সব বিষাক্ত (টক্সিক) যৌগগুলি থাকে তা শরীরে ভয়ানক ক্ষতি করে। নিয়মিত পান করলে মৃত্যুও হতে পারে। গরু সহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর মূত্র সংক্রামক অসুখ লেপটোস্পাইরোসিস-এর কারণ। এই অসুখ মুখের ভিতরের মাংস ও চামড়ায় ক্ষয় ঘটায়, ছড়িয়ে পরে। **গরুর মল বা গোবর অ্যান্টিসেপটিক – এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন শুধু নয় মারাত্মকভাবে আমাদের ভুলপথে পরিচালনা করে।** মলত্যাগের সময় গরু বা অন্য যে কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া নির্গত হয়। সুতরাং গোবর কোনো ঘায়ে লাগালে ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

নাইজিরিয়ায় গোমূত্রকে বিষ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেদেশে ১৯৭৫ সালে এক পরীক্ষাগারে ইঁদুরের উপর গোমূত্র নিয়মিত প্রয়োগ করে তার বিষক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে ধারাবাহিক প্রয়োগের ফলে ওই ইঁদুরগুলি মারা গেছে। ওই দেশে ১৯৭৭ সালে কুকুরের উপর প্রয়োগ করেও দেখা গেছে যে কুকুরগুলিকে নিয়মিত গোমূত্র সেবন করানোর ফলে তারা কার্ডিওরেসপিরেটরি সমস্যায় (শ্বাস কষ্টে) মারা যায়। রয়াল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গবেষণাপত্রে এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে।

কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব

এখন আলোচনায় উঠে আসা কিছু প্রশ্নের উপর চর্চা করা যাক।

১) হিন্দুত্ববাদীদের প্রচার অনুসারে গোমূত্রে যদি কোনো বিষাক্ত পদার্থ না-ই থাকে তবে তার শোধনের প্রয়োজন কী? আর তথাকথিত 'গোনাইল'-এ নিমের নির্যাস এবং পাইনের সৌরভ মেশানোর প্রয়োজন কী? প্রয়োজন আছে। কারণ হাসপাতাল এবং অফিসে গোমূত্র ছড়ালে মশা-মাছি-জীবাণু ভরে যাবে। দু-চারদিনেই দুর্গন্ধে চারদিক ভরে যাবে এবং মানুষ তা ধরে ফেলবে। তাই জলে নিমের নির্যাস, পাইনের সৌরভ এবং কিছু কীটনাশক এবং দু-চার ফোঁটা গোমূত্র দিয়ে গোনাইল বানানো হচ্ছে। এটা একটা ধাপ্পাবাজি।

২) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গাঁধী বলেছেন ফিনাইলে পরিবেশ দূষণকারী রাসায়নিক আছে যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে আর গোনাইলে রাসায়নিক নেই তাই তা পরিবেশ বান্ধব। এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বহুক্ষেত্রে প্রচার করেন বহু শিক্ষিত মানুষ। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই রাসায়নিক মৌল বা যৌগ দিয়ে তৈরি। জলেও রাসায়নিক মৌল হিসেবে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আছে। জৈব পদার্থ মানে কি অরাসায়নিক কিছু? তাতেও হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং অন্যান্য অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থ আছে? জীবাণু নাশক ফিনাইল পরিবেশ বান্ধব নয় এই তত্ত্ব কি বিজ্ঞান সম্মত? গোনাইলে বাস্তবে কোন এফেক্ট বা মানবজীবনের পক্ষে ভূমিকা নেই, বরং তাতে যদি সত্যিই গোমূত্র থাকে তবে তাতে ভয়ঙ্কর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবে আর গোমূত্র না থাকলে হবে না।

৩) গোমূত্রে তামা বা সোনার কোনো যৌগের উপস্থিতি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কাল্পনিক।

৪) 'হোলি কাউ ফাউন্ডেশন'-এর প্রধান শ্রীমতী অনুরাধা মোদি, আই আই টি'র অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার বিজয় বলেছেন গোমূত্রে জীবাণু নাশক, ছত্রাক নাশক গুণাগুণ আছে। একথা তাঁরা জানলেন কেমন করে? না, বিভিন্ন আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা একথা বলেছেন। তাঁরা জানলেন কিভাবে? না, পুরাণের কাহিনীতে বলা আছে? এখন প্রশ্ন হল প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় বা সপ্তম শতাব্দীতে রচিত চরক সংহিতা, শুশ্রুত বা ভাগবতের যুগে মানুষের জীবাণু বা ছত্রাক সম্বন্ধে ধারণা জন্মালো কোথা থেকে? অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগে খালি চোখে দেখা যায় না এমন জীবাণু সম্পর্কে মুনি ঋষিরা সব জেনে বসে থাকলেন? পৌরাণিক কাহিনীর সাথে বিজ্ঞানের মিশেল শুনতে ভাল লাগলেও কার্যত তা অর্থহীন এবং কখনও বিপজ্জনক।

৫) শ্রীমতী মানেকা গাঁধী বলেছেন গোনাইল ব্যবহার করলে গরুর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং সমাজে তার মূল্য আরও বাড়বে। শ্রীমতী মোদি বলেছেন যে গোনাইলের ব্যবহার গরুকে বাঁচাবে। এই কথাগুলির অর্থ কী? গোমূত্র এবং গোবর গোনাইল তৈরিতে, ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার হলে গরুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার অর্থ কী? গোনাইলের প্রবক্তাদের এই কথাগুলির মধ্যে গূঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে। মিথ্যা প্রবচনের আড়ালে পঞ্চগব্যের ব্যবহার বাড়লে হিন্দুত্ববাদীদের প্রচার অনুসারে গরু মহিমান্বিত হবে এবং গোমাংস ভক্ষণকারীরা কোনঠাসা হবে। পঞ্চগব্যকে সর্বরোগহরা বলার আসল টার্গেট হল সেইসব মানুষ যারা গরুকে দেবতা হিসেবে না দেখে গৃহপালিত উপকারী প্রাণী হিসেবে দেখেন তারা।

৬) হিন্দুত্ববাদীরা বলছেন অসংকর গরুর গোমূত্র এবং গোবর ৯০-৯৮% রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন কিন্তু সংকর

গরুর সেই ক্ষমতা লোপ পায়। এই কথা থেকেই বোঝা যায় গোমূত্র ও গোবরের মহিমা প্রচারের পিছনে যত না বিজ্ঞান তার চেয়ে বেশি আছে সনাতন ধর্মের কাহিনী। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে সংকরকরণ প্রক্রিয়ায় গরুর দুধের পরিমাণ ও গুণ, প্রজনন ক্ষমতা, কর্মক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ দেশে শুদ্ধ অসংকর গরুর তুলনায় সংকর প্রজাতিগুলির সংখ্যা বাড়ছে। এই প্রক্রিয়া বাড়লে ধর্মের মাহাত্ম কমে। তাই এইসব যুক্তি পেশ করা হচ্ছে। তাছাড়া মানুষের জীবনে প্রায় একই কাজে লাগে যে মহিষ তাকে গরুর ন্যায় মহিমান্বিত করা হয় না কেন? একটি মহিষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসংকর গরুর তুলনায় বহুগুণ বেশি দুধ দেয়। মহিষকে কৃষি কাজে, মাল ও যাত্রী পরিবহনে ইত্যাদি সব কাজে আজকাল অনেক বেশি ব্যবহার করা হয়। তবে গোনাইলের ন্যায় "মোনাইল" তৈরি করা হচ্ছে না কেন? কারণ তা করলে শাশ্বত সনাতন ধর্মের মহিমা বাড়বে না।

৭) গোমাতার শরীর থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য বা রেচন পদার্থগুলি জীবজগতের তথা মানুষের যদি এতই কল্যাণে লাগে তবে সেই গরুর মাংসের কোনো গুণাগুণ নাই কেন? গোমাংস ভক্ষণ অপরাধ? কোনো বিজ্ঞানের ছাত্রের কথা বাদ দিন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ এই অযৌক্তিক কথা মেনে নেবেন কী? কেউ গোমাংস ভক্ষণ করবেন কি করবেন না সেটা তার ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন। কিন্তু গোমাংসে প্রোটিন ও ফ্যাটজাতীয় পদার্থের যে সমাহার,তার যা খাদ্যগুণ তাকে অস্বীকার করা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা নয়?

৮) সবশেষে বলা যায় ধর্ম এবং পৌরাণিক অলৌকিক কাহিনীর বিশ্বাস থেকে কেউ গোরুকে মাতা হিসাবে পূজা করতে পারেন। গোমূত্র এবং গোবরের উপকারিতায় বিশ্বাসী হতে পারেন। তাতে সমগ্র সমাজের কিছু এসে যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র যখন অবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মোড়কে সাজিয়ে তা সমগ্র সমাজের উপর প্রয়োগ করতে চায় তখন তা কি ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী, স্বেচ্ছাচারী এবং অন্ধত্বকে উৎসাহ প্রদান করা নয়? পাঠকেরাই ভেবে দেখবেন।

তাহলে গোমূত্র এবং গোবরের মাহাত্ম প্রচার কেন?

আমরা সকলেই জানি যে গরু একপ্রকার গৃহপালিত নিরীহ জীব। প্রাচীন কাল থেকেই ভেড়া, শূকর, মহিষ, ছাগল, মুরগি, উটের মত গরুকে মানুষ লালন পালন করে আসছে। কৃষিকাজে নির্বীজ ষাঁড় (বলদ)-এর ব্যবহার এদেশে বহুকাল ধরেই হয়ে আসছে। গোপালনের মূল উদ্দেশ্য দুধের যোগান। এই দুধ থেকে নানা দুগ্ধজাত সামগ্রি মানুষ প্রস্তুত করে ব্যবহার করে যেমন দই, ছানা, ক্ষির, পনির, চিজ, মাখন ইত্যাদি। গোবর শুকিয়ে জ্বালানিও হয় খড়-কুটো-মাটি মিশিয়ে। মাটির ঘরের ফাটল বোজাতেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে যদিও তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। গোমাংস ভক্ষণ, মৃত গরুর চামড়া থেকে চর্মজাতীয় পণ্য তৈরি হয়। কৃষিকাজ ছাড়াও বলদকে ঘানিতে সরষে পেশাই এবং সওয়ার ও মাল পরিবহনে ব্যবহার করা হয়। এইসব কারণে মহিষ, ভেড়া, ঘোড়া, ছাগলের ন্যায় গরুও মানুষের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জীব। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবক্তারা গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও প্রাচীনকালে মুণি-ঋষিরা বৃষ (ষাঁড়) হত্যা করে ভক্ষণ করত। পুরাণে এর উল্লেখ আছে। বৃষোৎসর্গ যজ্ঞে বৃষবলি ছিল স্বাভাবিক।

পরবর্তীকালে গরুকে ঈশ্বরের স্থান দিয়ে গোমাতাকে বিশ্বমাতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবক্তারা নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচার করেছে। হিন্দুত্ববাদীদের কাছে অস্পৃশ্য শূদ্রগণ এবং বিধর্মীরা এই কল্পকাহিনীতে বিশ্বাসী নন বলে তারা গরুকে আর পাঁচটা গৃহপালিত জীব হিসাবে পালন করেন। বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ভারতের দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায় এবং মুসলমানদের একাংশ গোমাংস ভক্ষণ করে বলে হিন্দুত্ববাদীরা গোহত্যা নিষিদ্ধ করার দাবি করে আসছে বহুদিন ধরে। দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে গোহত্যা-গোমাংস বিক্রি নিষিদ্ধও করা হয়েছে। বহু দাঙ্গাও হয়েছে বহুবার।

গরুকে নতুনভাবে মহিমান্বিত করার জন্য তাই হিন্দুত্ববাদীরা নতুন চাল চেলেছে। তথাকথিত বিজ্ঞানী, এনজিও, মন্ত্রী-নেতাদের দিয়ে গোমূত্র ও গোবরকে সর্বরোগহরা প্রমাণ করার জন্য গোনাইল বাজারে আনা হচ্ছে। বাজারজাত করে এনজিও, কিছু ব্যবসায়ী, শিল্পপতির রোজগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারি হাসপাতাল ও দপ্তরে ফিনাইলের বদলে গোনাইল ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশিকার মাধ্যমে গোমাতা এবং তার প্রচারক হিন্দুত্ববাদীরা মহিমান্বিত হবে, অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে আঘাত হানা যাবে এবং নতুন করে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে, বিভেদের বীজকে জাগ্রত করে বিজ্ঞানসম্মত চেতনার বিকাশের বিরুদ্ধে অন্ধত্বকে চাপিয়ে দেওয়া যাবে। হাসপাতালে ও সরকারি দপ্তরে গোনাইল চালুর আসল উদ্দেশ্য এটাই। আজ পুঁজিবাদী বিশ্বের দেশে দেশে এইভাবেই অন্ধবিশ্বাসকে চাপিয়ে দিয়ে বিজ্ঞান সম্মত চেতনার বিকাশকে রুদ্ধ করার প্রয়াস চলছে। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ কি বিজ্ঞানের মোড়কে এই অন্ধত্বের আগ্রাসন মেনে নেবেন?■

সমাজ দর্পণ

ম্যাগি বিতর্ক এবং তারপর...

গত ৫ই জুন ২০১৫ মানুষের পক্ষে 'অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ' অভিযোগে বিশ্বখ্যাত নেস্‌লে কোম্পানির ম্যাগির ৯টি খাবারকেই ভারতের বাজার থেকে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'। একই সঙ্গে এই পণ্যের নির্মাতা সংস্থা নেস্‌লেকে শো-কজ নোটিশ পাঠিয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছে। ওইদিন রাতেই ভারতের বাজার থেকে 'টু মিনিট্‌স ম্যাগি' নুডলসের সমস্ত প্যাকেট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায় নেস্‌লে ইন্ডিয়া। সুইজারল্যান্ড থেকে উড়ে এসে পরদিন ৬ই জুনই সাংবাদিক সম্মেলন করে নেস্‌লে গ্লোবাল এর সি ই ও পল বাল্ক বলেন "ভিত্তিহীন কিছু অভিযোগ ভারতে আমাদের পণ্য নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। ... ভারতীয়দের বিশ্বাস এবং আস্থা ফিরিয়ে দ্রুত আমরা ফিরে আসবো।"

ভারত, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ম্যাগি খুবই জনপ্রিয়। কিছুদিন আগে এই পণ্য পরীক্ষা করে তাতে সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত সীসা বা লেড এবং আজিনা মোতো বা মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন পরীক্ষাগারে ম্যাগির নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট পাওয়া গেছে ১৭ পি পি এম (পার্টস পার মিলিয়ন) অথচ এর সহনীয় মাত্রা হল ০.০১ পি পি এম। এই আজিনা মোতো বিভিন্ন রেসটুরেন্টের খাবারে দিতে দেখা যায়, বিয়ে বাড়ির রান্নাতেও। এতে খাদ্যের সুগন্ধ বাড়ে এবং সংরক্ষণে সুবিধা হয়। শিশু বিশেষজ্ঞ ডঃ অরুণ সিং সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন যে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট এক ধরণের প্রতারক খাদ্যবস্তু। তিনি বলেন "এটা এমন একটা উপাদান যেটা খাবারে থাকার জন্য বাড়ন্ত শিশু কিশোরদের মনে হবে তারা সুস্বাদু প্রোটিন জাতীয় জিনিস খেয়েছে। খেয়ে তারা সন্তুষ্ট হবে, কিন্তু আসলে শরীরে খাদ্যের অভাব থেকে যাবে।" এই খাবার দীর্ঘদিন খেলে মাথার যন্ত্রণা, বমির প্রবণতা, হজম শক্তির গন্ডগোল হয়। শিশুদের মধ্যে এইসব ফাস্ট ফুড খেতে শুরু করলে এটা রোজ খাবার একটা নেশা তৈরি হয়। যদিও রাজ্যের মুখমন্ত্রী তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বলেন 'এতে খারাপ কিছু পাওয়া যায় নি'।

এখন আবার ম্যাগি নুডলসের বিজ্ঞাপনে অমিতাভ বচ্চন, প্রীতি জিন্টা, মাধুরী দিক্ষীত প্রভৃতি বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অংশ নেওয়ার জন্য বির্তক শুরু হয়েছে। ২০০৮ সালে আমেরিকার ফেডারেল ট্রেড কমিশন বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কতগুলো প্রস্তাব দেয়। সেখানে বলা হয়েছিল কোন বিজ্ঞাপনে যদি বিভ্রান্তি তৈরি বা মিথ্যা কিছু প্রচার হয় তবে তার জন্য যে সংস্থার বিজ্ঞাপন সে শুধু দায়ী থাকবে না, দায়ী থাকবেন বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণকারী সেলিব্রেটিও।

গত ১১ই জুন ম্যাগির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আবেদন করে বম্বে হাইকোর্টে গেল নেস্‌লে গ্লোবাল। দিল্লী ও মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে আলাদা করে বাজার থেকে ম্যাগি তুলে নেওয়ার নির্দেশের বিরুদ্ধেও আদালতে গেছে নেস্‌লে কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য ম্যাগিতে ক্ষতিকারক পদার্থের উপস্থিতি রয়েছে এমন দাবি অস্বচ্ছ। তারা পণ্য বাজারে ছাড়ার আগে নিজেরা একাধিকবার গুণমান পরীক্ষা করিয়েছেন এবং তাতে কোন ক্ষতিকারক দিক উঠে আসে নি। এইসব রিপোর্টও তারা জমা দিয়েছেন।

এটা স্মরণে রাখা দরকার যে সাত বছর আগে ব্রিটেনে নিষিদ্ধ হয়েছিল একটি ম্যাগি নুডলসের বিজ্ঞাপন। এতে বলা ছিল ম্যাগি খেলে হাড় ও পেশি শক্তিশালী হয়। একই কারণে ব্রিটেনে নিষিদ্ধ হয়েছিল হরলিক্সের একটি বিজ্ঞাপনও। হরলিক্স খেলে শিশুরা 'লম্বা, শক্তিশালী এবং মেধাবী' (Taller, Stronger & Sharper) হয় এই অবৈজ্ঞানিক দাবি উড়িয়ে দিয়েছিল ব্রিটেনের অ্যাডভার্টাইজিং অথরিটি (এ এস আই)। এমন বিজ্ঞাপন এদেশে বহুদিন ধরে চলে আসছে এবং এই পণ্য কেনার জন্য মা-বাবা রা দোকানে দোকানে লাইন দিচ্ছেন। এখন কৌতুকের ব্যাপার হল এই যে আইনী ঝামেলা থেকে বাঁচতে সেই সময় দুই কোম্পানিই বলেছিল – বিজ্ঞাপনগুলি তৈরি করা হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য কিন্তু ভুলবশত ব্রিটেনে তা সম্প্রচার হয়ে গেছে। অর্থাৎ উন্নত দুনিয়া ইউরোপ, আমেরিকায় জলজ্যান্ত মিথ্যা চলতে একটু সমস্যা থাকলেও তৃতীয় বিশ্বে তা চলতেই পারে!

যাই হোক বিভিন্ন পণ্যে ভেজাল, বিষ মেশানো, নেশার দ্রব্য মেশানো ইত্যাদি নিয়ে বহুকাল ধরেই বির্তক হয়। বিজ্ঞাপনে ছলনা, নগ্নতা, শ্রেণী / সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কানি, জলজ্যান্ত মিথ্যা ও অবৈজ্ঞানিক প্রচার নিয়েও বহু বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কি হয়েছে? কোকাকোলা, ক্যাডবেরির মত দামী বহুজাতিক কোম্পানি অথবা দেশী 'খাঁটি' ঘি-মাখন-তেল প্রস্তুতকারীদের খাদ্যে ভেজাল মেশানোর কি শাস্তি হয়েছে?

চার দশক আগে বি বি সি-র জন্য 'ওয়েস অব সিয়িং' নামের একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেছিলেন ব্রিটিশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমালোচক জন বার্জার। এখানে বিজ্ঞাপনকে তিনি সর্বদাই 'অলীক' হিসাবে দেখিয়েছিলেন। বার্জারের মতে বিজ্ঞাপন হলো সর্বদাই সত্যের বিপরীত অবাস্তব একটি প্রদর্শন। কিন্তু এটা এমন শৈল্পিকভাবে তৈরি করা হয় যাতে মানুষের মনের উদ্বেগ আর আকাঙ্খাকে স্পর্শ করতে পারে। মানুষ যদি দেখা মাত্র অনুভব করতে পারে, হ্যাঁ এই পণ্য বা পরিষেবাটি কিনলে সুখ, স্বস্তি বা মুক্তি পেতে পারি, এটা পাওয়া সম্ভব; তবেই সেটা বিজ্ঞাপন। মানুষকে বর্তমান সমস্যা থেকে বের করে সমাধান দেওয়ার প্রতিশ্রুতিই বিজ্ঞাপন। অসুখী মানুষের কাছে সুখের স্বপ্ন বিক্রি করাটাই বিজ্ঞাপন।

সুতরাং দেশী-বিদেশী পুঁজিসংস্থাগুলি যে পণ্য প্রস্তুত করে বাজারে ছাড়ছে এবং তার বিজ্ঞাপন করছে তার উদ্দেশ্যও সুখের স্বপ্ন বিক্রি করে মুনাফা, অতি মুনাফা করা। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে পেরে না উঠলে রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর একাংশ অন্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, প্রতারণার অভিযোগ আনে বাজার দখলের জন্য। পরবর্তিতে পাল্টা লড়াইও হয়। শেষমেস হয় সমঝোতা। আবার রমরম করে চলে সেই পণ্য। নেস্‌লে গ্লোবাল এক অতিকায় বহুরাষ্ট্রীয় কোম্পানি। সে তার পুঁজিশক্তির জোরে সহজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিকেষ করে তার ম্যাগিকে অদূর ভবিষ্যতেই 'ত্রুটিমুক্ত এবং স্বাস্থ্য সম্মত' বানিয়ে ছাড়বে! দু-একটা ব্যাচ নম্বরের মাল হয়ত ভারতের বাজার থেকে সরিয়ে নেবে এই যা। এর সাথে সাথে তার পণ্যের প্রচারক সেলিব্রেটিরাও ছাড় পেয়ে যাবেন। মুনাফাখোড়ী ব্যবস্থা জারি থাকবে আর প্রতারণা হবে না, ন্যায় বিচার মিলবে এই আশা দুরাশা। পুঁজিবাদী সমাজে তাই অমুক পণ্য ভাল, তমুক পণ্য নিষিদ্ধ কর এইসব দাবি বাতুলতা। ■

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আহ্বান

মুনাফা নয়, জনস্বার্থে চালিত হোক পরিবেশ ভাবনা

[*ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ ৫ই জুন ২০১৫, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেছে। গুরুত্ব বিচার করে আমরা মূলঅংশ পুনর্মুদ্রণ করলাম।* – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। বিগত বছরগুলির মত এবারও বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশ দূষণের দায় কাঁধে নিয়ে জনগণকে অঙ্গীকার নিতে হচ্ছে দূষণ মুক্ত পরিবেশ তৈরী করার। বায়ু দূষণ, স্তূপীকৃত বর্জ্য, শিল্পদূষণ, বন ধ্বংসকরণ থেকে শুরু করে হাওড়া নদীর জল দূষণ – সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে আমার আপনার কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে। বস্তুতঃ সারা বছর পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা, প্রচার সত্ত্বেও পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগও বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। বড় বড় রাষ্ট্রনায়কেরা দামী দামী বৈঠক করেও কোনো সমাধানে পৌছুতে পারছেন না – শেষ পর্যন্ত দায়ী করা হচ্ছে আমজতার 'কর্মফল'কে। 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' এবং সামগ্রিকভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রসঙ্গে বিরোধী মতামত শোনা যাচ্ছে। 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং মনুষ্য সৃষ্ট' – এমনটা এখনও প্রমাণই করা যায়নি অথচ এই অছিলায় কোটি কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী বিক্রী হয়ে গেছে আমাদের ঘরে ঘরে। কয়লা ও পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানীর সঙ্গে সৌরশক্তি ও অপ্রচলিত জ্বালানীর উৎপাদকদের সংঘাতের কোনো সমাধান দেখা যাচ্ছে না। দু'পক্ষের প্রবক্তারাই তাদের পক্ষের জ্বালানী ও তৎসম্পর্কিত প্রযুক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের পক্ষে জোর সওয়াল করছেন।...

এই বিশাল পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশের সুরক্ষা থেকে আমাদের ছোট্ট শহর আগরতলার আবর্জনার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা – কোনোটাই সুসংহত জনকল্যাণকামী পরিকল্পনা ছাড়া আমার আপনার একক প্রচেষ্টায় রূপায়ন সম্ভব নয়। বন ধ্বংস করা হবে কি বাঁচানো হবে, শিল্প কারখানা দূষণ করবে কি করবে না, কারখানার বর্জ্য নদীতে কি মাত্রায় মিশবে, নদীর বা খালের ধারের বস্তিগুলির সুষ্ঠু পুনর্বাসন হবে কি হবে না, শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোন্ নীতিতে হবে – এইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার-আপনার মতো সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্ব কি সত্যিই থাকে? মানুষকে বাদ দিয়ে পরিবেশ নিয়ে ভাবা যায় না। সাধারণ মানুষের নিম্নমুখী জীবনযাত্রার দুঃসহ অবস্থায় দাঁড়িয়ে বাঘ-ভাল্লুক বাঁচানোর জন্য স্লোগান তোলা তাই অর্থহীন। অন্যান্য জায়গার মতো আমাদের এই রাজ্যেও বস্তি উচ্ছেদ করে করে মানুষগুলোকে আবাসনের নামে ইট-সিমেন্টের

তৈরী যে ছোট-ছোট বাক্সগুলিতে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে সেগুলি কি সত্যিই মানুষ থাকার মতো আবাসন? রাস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাস্টবিনের বন্দোবস্ত না করে অথবা বর্জ্যের নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত অপসারণ না করে সাধারণ মানুষের মানুষ থাকার মতো আবাসন? রাস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাস্টবিনের বন্দোবস্ত না করে অথবা বর্জ্যের নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত অপসারণ না করে সাধারণ মানুষের কাছে যত্রতত্র আবর্জনা না ফেরার আহ্বান কতটা ফলদায়ী হতে পারে? দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনা মাফিক জলসঙ্কটের প্রচার করে এখন পানীয় জলের পণ্যায়ন সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রথমে বোতলবন্দী জল, আর এখন বাড়ি বাড়ি জলের মিটারিং সেরে ফেলা হচ্ছে দেশের অন্যান্য শহরের মত। একবার ভাবুন তো, সঙ্কট যদি সর্বব্যাপী হয় তাহলে বাজারে পয়সা দিলেই অঢেল জল পাওয়া যায় কি করে? গোটা দেশের কথা না বলে শুধু আমাদের রাজ্যেই গত ৭-৮ বছরে বোতলজাত পানীয় জলের কতগুলি কোম্পানি খুলেছে সেদিকে নজর দিলেই ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হয়। সংকটের দেদার প্রচার এভাবে সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির এভাবে পণ্যীভবন করা হচ্ছে কার স্বার্থে? ... স্বাভাবিক অরণ্যের জৈববৈচিত্রকে ধ্বংস করে রবার-ইত্যাদির মতো গাছের মনোকালচার করে বনসৃজনের ঢাক পেটানো হচ্ছে খোদ সরকারি তরফে। শুধু ত্রিপুরা নয় ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীর বর্ষাবনের প্রায় ৭০ শতাংশ কেটে নিয়ে গেছে কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা, আর অন্যদিক 'গাছ কাটিয়া নিজে পায়ে কুড়াল' মারিবার দায় সম্পূর্ণ জনগণের ঘাড়ে।... অথচ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে আমজনতার মনে বৃক্ষনিধনের সমস্ত দায় ও পাপবোধ ঢুকিয়ে প্রকৃত বৃক্ষ নিধনকারীরা থেকে যাচ্ছেন আড়ালেই।...

মুনাফার লক্ষ্যে জীবন ও জগতের সমস্ত উপাদানকে পণ্য করে তোলা এই সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থায় আমাদের আওয়াজ কি প্রশাসন ও সরকারের কানে পৌঁছায়? বড় বড় কর্পোরেট গোষ্ঠীর হাতে মুনাফা তুলে দেওয়াই কি পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি? আমরা কোনটা চাইব? মুনাফার দায়ী 'বনসৃজন' নাকি পরিবেশকে মানব সমাজ তথা সমগ্র জীবজগতের বাসযোগ্য করার সামাজিক পদক্ষেপ? যে শাসকেরা পরিবেশ নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে তারা প্রায় প্রতিদিন নিজেদের অবস্থানও পাল্টাচ্ছে—নতুন নতুন মুনাফার সম্ভাবনায় নতুন নতুন বক্তব্য এনে হাজির করছে রোজ। আমরা কি শুধুই বিভ্রান্ত হব? হিরোসীমা-নাগাসাকি থেকে ভূপাল গ্যাস কাণ্ডের জন্য দায়ী কে? আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা? এই অবস্থায় দাঁড়িয়েও শাসকশ্রেণীর প্রচার আমাদেরকে এখনো চালিত করে। মালিক শ্রেণীর পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি ও প্রচার রাষ্ট্রসংঘ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার হয়ে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে এসে পৌঁছায়। এই বিষয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদেরও আলাদাভাবে কিছু করার কোনো এক্তিয়ার থাকে না। ফি বছর রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ বিষয়ক দপ্তর থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম, শ্লোগান, কর্মসূচীতে আম জনতার ব্যক্তিগত দায় ও কৃচ্ছ্রসাধনের ঢালাও উপদেশামৃত ও নির্দেশিকার বাহুল্য থাকলেও থাকে না সামাজিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়নের নির্দেশ বা পরিবেশের প্রকৃত ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কথা। তবুও বিভিন্ন এন.জি.ও. পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞানের শিক্ষক-অধ্যাপকেরা বিনা বিতর্কে উপর থেকে আসা থিম্ অথবা আপনি 'কি করবেন, কি করবেন না'— এই ফর্দ প্রচার করতে থাকেন।

সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 'ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ' সমস্ত সচেতন নাগরিকদের কাছে আবেদন রাখছে পরিবেশ সুরক্ষার নামে কর্পোরেট স্বার্থ সুরক্ষার পরিবর্তে প্রকৃত জনকল্যাণকামী পরিবেশ পরিকল্পনার জন্য সরকার ও প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে। এই লক্ষ্যে যে সমস্ত বিজ্ঞান ও সামাজিক সংগঠন জনমত ও আন্দোলন সংগঠিত করছে তাদের প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করে জনশক্তিকে আরো সুসংহত করার জন্য 'ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ'র প্রয়াসে আপনিও সামিল হোন।■

পত্রিকা প্রকাশের বিলম্ব হওয়া প্রসঙ্গে সম্পাদকের মতামত

দীর্ঘ ৬ মাসের বেশি সময় পার করে সমীক্ষণের পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হল। এত দেরি হওয়ার জন্য বহু পাঠক আমাদের ই-মেইল করেছেন, টেলিফোনে এবং সদস্যদের কাছে সাক্ষাতে হতাশা প্রকাশ করেছেন। পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার জন্য সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষ থেকে সকল পাঠক এবং সদস্যদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সময়মত রচনা প্রস্তুত না করতে পারার জন্য আমরা পাঠক ও সদস্যদের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। বার্ষিক অনুষ্ঠানে আলোচিত ধর্ম-সমাজ ও বিজ্ঞান নিবন্ধটি আমরা স্থানাভাবে এই সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারলাম না। আগামী সংখ্যায় তা অবশ্যই প্রকাশিত হবে।

জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান

মানুষের চোখে আকাশের রঙ কী এবং কেন?

দিনের বেলায় পরিষ্কার আকাশ (মেঘ, কুয়াশা, ধোঁয়াশা ... মুক্ত) মানুষের চোখে নীল দেখায়। কিন্তু কেন?

দিনের বেলায় সূর্যালোক বিভিন্ন বস্তু কর্তৃক প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছায় – তাই প্রাকৃতিকভাবেই দিনের বেলায় সহজেই আমরা সবকিছু দেখতে পাই। সূর্য থেকে দৃশ্যমান আলোক রশ্মি আমাদের কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই বেশ ভালো পরিমাণে – বায়ুমন্ডলে উপস্থিত বিভিন্ন কণা ও অণুর দ্বারা শোষিত, নিক্ষেপিত ও প্রতিফলিত হয়। এই প্রক্রিয়াগুলির বেশিরভাগই আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ।

আকাশের রঙ নীল হওয়ার কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করার প্রথম পদক্ষেপ রাখেন জন টিন্ডাল। তার প্রদর্শিত পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় – ভাসমান ক্ষুদ্র কণাপূর্ণ কোনো প্রবাহীর (ফ্লুয়িড) মধ্য দিয়ে যখন আলো যায় তখন লাল বর্ণ অপেক্ষা নীল বর্ণের আলো বেশি নিক্ষিপ্ত হয়। এর কিছুদিন পরে লর্ড রেলাই দেখান যে আলো নিক্ষেপণের পরিমাণ তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে (λ) চতুর্থ ঘাতের ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যতকম তার নিক্ষেপনের (স্ক্যাটারিং) পরিমাণ তত বেশি। এই কারণেই নীলবর্ণের আলো, লাল বর্ণের আলো অপেক্ষা বেশি নিক্ষেপিত হয়।

স্ক্যাটারিং (নিক্ষেপন) কাকে বলে?

যদি আলোক রশ্মি কোন কণা বা অণুর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশনের পরে বিভিন্ন দিকে নির্গত হয় তবে ঐ ঘটনাকে স্ক্যাটারিং / নিক্ষেপণ বলা হয়। বাহ্যিক শক্তির উৎস দ্বারা উত্তেজিত হয়ে কোনো কণা বা অণু থেকে আলোক শক্তি বিভিন্ন দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। কোন বর্ণের আলো নিক্ষেপিত হবে তা কণার আকারের উপর নির্ভরশীল। আগেই বলা হয়েছে যে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বেশি নিক্ষেপিত হয়। তাই নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র হওয়ায় তা বেশি পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হয় – ফলে আকাশ নীল রঙের দেখায়।

কিন্তু বিজ্ঞানী রেলাই এবং টিন্ডাল-এর ধারণা ছিল – বায়ুমন্ডলে উপস্থিত জলকণা ও ধূলিকণার সঙ্গে সূর্যালোকের ইন্টারঅ্যাকশন -এর ফলেই নীল আলো নিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা অনুভব করেন যে যদি বায়ুতে উপস্থিত জলকণা ও ধূলিকণাই আলোর স্ক্যাটারিং ঘটায় তবে স্থানভেদে ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুতে উপস্থিত জলকণা ও ধূলিকণার পরিবর্তনের ফলে পরিষ্কার আকাশের রঙ বিভিন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু তা তো হয় না। পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল – বায়ুমন্ডলে উপস্থিত জলকণার মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান বর্ণালীর লাল প্রান্তের আলো শোষিত হয় – ফলে জলের স্তরের মধ্য দিয়ে কয়েক মিটার যাবার পরে শুধু নীল বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু বায়ুমন্ডলে জলকণার পরিমাণ এতই কম যে, তা আকাশের রঙ নীল দেখানোর জন্য যথেষ্ট নয়। প্রকৃপক্ষে সমগ্র পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে উপস্থিত জলকণার সমষ্টি – পৃথিবীর চারিপাশের বায়ুমন্ডলের বড়জোড় ১ সেমি পুরু একটি স্তর সৃষ্টি করতে পারে। যা বর্ণালীর লাল প্রান্তের আলো শোষণের জন্য প্রয়োজনীয় জলস্তরের বেধের তুলনায় নগণ্য।

বায়ুমন্ডলে উপস্থিত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং এই দুই প্রকার অণুই দ্বিমেরু বিশিষ্ট। এরা দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফলে এই দুই প্রকার অণুই বায়ুমন্ডলের প্রতিটি বিন্দুতেই **রেলাই স্ক্যাটারিং** ঘটাচ্ছে এবং তা কোনো দর্শকের চোখে সমস্ত দিক থেকেই নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। নিক্ষেপনের নিয়মানুযায়ী দৃশ্যমান আলোক বর্ণালীর বেগুনী-নীল প্রান্তের আলোই বেশি নিক্ষিপ্ত হয়। নিক্ষেপন উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন গাঢ় ব্যাকগ্রাউন্ড – বায়ুমন্ডলের ক্ষেত্রে যা হলো কালো মহাবিশ্ব (ইউনিভার্স)। নীলবর্ণের নিক্ষেপণ উপলব্ধি করার জন্য বায়ুমন্ডলের বেধ যথোপোযুক্ত – যা হলো অপটিক্যালি থিন। যদি পৃথিবীর বায়ুমন্ডল বর্তমান অপেক্ষা বেশি পুরু হতো তবে তা সর্বত্র অনুরূপ উপাদানের অনুপাতে হলেও আকাশের রঙ বিভিন্ন হত। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সূর্যালোককে দিনের অন্য সময় অপেক্ষা অনেক বেশি বায়ুমন্ডলীয় পথ অতিক্রম করতে হয়। এই দুই ক্ষেত্রেই বেশির ভাগ নীল আলো নিক্ষিপ্ত হয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে যায় এবং আপেক্ষিকভাবে লাল আলো বেশি উপস্থিত থাকে এবং আমাদের চোখে পৌঁছায়।

আকাশের রঙ নীল দেখানোর কারণ যে বায়ুমন্ডলে উপস্থিত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন অণু দ্বারা নীল আলোর নিক্ষেপন তা চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের, নিক্ষেপণ সংক্রান্ত গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাঁর ব্যাখ্যায় আলোক তরঙ্গের তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্র দ্বারা আবেশিত (N_2 ও O_2) অণুর তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামকের কারণেই অণুগুলি আলোক

নিক্ষেপণ করতে সমর্থ হয়।

প্রকৃতির সমস্ত নীল বর্ণই কিন্তু স্ক্যাটারিং-এর জন্য উদ্ভব হয় না। সমুদ্রের নীচের আলোর বর্ণ নীল হওয়ার কারণ দীর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি জলের মধ্যে ২০ মিটারের বেশি পথ অতিক্রম করার সময় জলের অণু দ্বারা শোষিত হয়ে যায়। সমুদ্রের তীর থেকে সমুদ্র নীল দেখানোর কারণ অবশ্যই নীল আকাশের প্রতিফলন। কিছু পাখী ও প্রজাপতিকে নীল দেখানোর কারণ নীল আলোর বিচ্ছুরণ।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি নীল আলো ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হওয়ায় বেশি নিক্ষেপিত হয় ফলে আকাশ নীল বর্ণ ধারণ করে তবে সৌর বিকিরণের দৃশ্যমান আলোকের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বেগুনীর বর্ণের রশ্মির উপস্থিতি সত্ত্বেও আকাশের রঙ বেগুনী হয় না কেন?

বায়ুমন্ডলের উপরিস্তর দ্বারা শোষিত হওয়ার জন্যই শেষ পর্যন্ত সামান্য পরিমাণে বেগুনী বর্ণের আলো উপস্থিত থাকে। কিন্তু রামধনুতে তো যথেষ্ট পরিমাণে বেগুনী বর্ণ পরিলক্ষিত হয়। কাজেই প্রদত্ত উত্তর সন্তোষজনক নয়। আকাশের রঙ বেগুনী না হওয়ার প্রকৃত উত্তর আলোক বিজ্ঞানে পাওয়া যাবে না – পাওয়া যাবে মানব দেহের শরীর বিজ্ঞানে। যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে মানুষ কিভাবে বিভিন্ন বর্ণ উপলব্ধি করতে পারে। এর আগে জানা দরকার বর্ণ/রঙ কী? জানা দরকার আমরা কিভাবে কোন বস্তুকে দেখতে পাই? তারপর জানব বর্ণ/রঙ উপলব্ধি করার পদ্ধতি।

বর্ণ/রঙ কি?

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, বর্ণ আলোকের নিজস্ব কোন ধর্ম নয় – আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বিচ্যুতির পার্থক্যের জন্য মানব দর্শন ব্যবস্থা দ্বারা উপলব্ধ বিশেষ অনুভূতি মাত্র। মানুষের একটি বংশগত রোগ – বর্ণান্ধতা – যা প্রমাণ করে বর্ণ আলোকের ধর্ম নয় বরং মানুষের/জীবের অনুভূতি মাত্র। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আমাদের চোখ প্রাকৃতিক বর্ণ-বৈচিত্র উপলব্ধি করার সামর্থ অর্জন করেছে – যা জীবন সংগ্রামকে সহজ করেছে। সূর্য থেকে বিকিরিত তরঙ্গের ৩৮০nm-৭২০nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোক রশ্মি মানুষের চোখে দৃশ্যমান।

আমরা কিভাবে কোনো বস্তু দেখতে পাই ?

কোনো বস্তু থেকে নির্গত বা প্রতিফলিত আলোক রশ্মি আমাদের চোখের কর্নিয়া'র মধ্য দিয়ে প্রবেশ ক'রে লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হয়ে রেটিনার উপর ফোকাস বিন্দুতে মিলিত হয়। আমাদের চোখের লেন্সের আকার লেন্স সংলগ্ন মাংসপেশী দ্বারা পরিবর্তিত হয়। কাছের বস্তুর জন্য লেন্স তুলনামূলক মোটা এবং দূরের বস্তুর জন্য পাতলা আকার ধারণ করে। রেটিনার উপর আলোক সংবেদনশীল দুই প্রকার গ্রাহক (ফোটোরিসেপ্টর) – **রড কোষ ও কোন কোষ** অবস্থিত। প্রতিটি আলোক গ্রাহক আলোক শোষণ করে এবং এর ফলে স্নায়বিক সংকেত উৎপন্ন হয়। সকল আলোক গ্রাহকে উৎপন্ন স্নায়বিক সংকেত জালকের আকারে চোখ থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং চোখ ও মস্তিষ্কের কোষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দর্শন অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

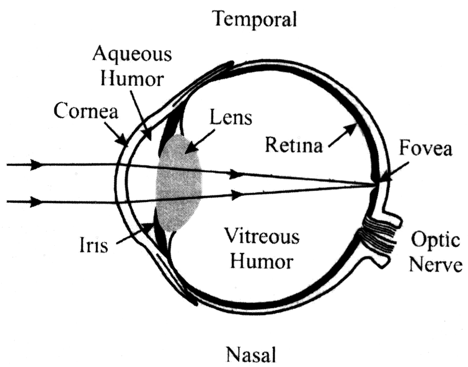

১. মানুষের চোখের ব্যবচ্ছেদ

রড কোষগুলি ক্ষীণ আলোকে উদ্দীপিত হয় – কিন্তু বর্ণ চিহ্নিতকরণের কোনও ভূমিকা থাকে না। কোন কোষগুলি তীব্র আলোকে উদ্দীপিত হয় এবং বর্ণ চিহ্নিতকরণে এরাই দায়িত্বশীল।

বর্ণ উপলব্ধিকরণ

যদি কোনো প্রাণীর চোখে **কোন কোষ** বর্তমান থাকে তবেই সে বর্ণ উপলব্ধি করতে পারবে। দৃষ্টি ও বর্ণানুভূতি অন্য সমস্ত অনুভূতির মত মস্তিষ্ক দ্বারা অনুভূত হয়। সুতরাং মস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যতীত বর্ণানুভূতি সম্ভব নয়। মানুষের মস্তিষ্ক সবচেয়ে উন্নত হওয়ায় মানুষ অন্যান্য সকল প্রাণী অপেক্ষা অনেক বেশি প্রকারের বর্ণ উপলব্ধি করতে পারে, যদিও কিছু প্রাণী আছে যারা এমন কিছু বিকিরণ তরঙ্গ উপলব্ধি করতে পারে যা মানুষ পারে না। যেমন মাকড়সা ও বেশিরভাগ পোকা অতিবেগুনী রশ্মি দেখতে পায়, মানুষ পায় না। মানুষ ব্যতীত কিছু প্রাণী ইনফ্রারেড রশ্মি দেখতে সক্ষম। (পরবর্তী পৃষ্ঠায় চার্ট দ্রষ্টব্য)

মানুষের চোখের রেটিনায় সাধারণভাবে ১০০ মিলিয়ন রড কোষ ও ৫ মিলিয়ন কোন কোষ বর্তমান। কোন কোষ তিন

প্রাণী		যে রঙ তারা দেখে
মাকড়সা	(লাফানো)	আল্ট্রা ভায়োলেট এবং সবুজ
পতঙ্গ	(মৌমাছি)	আল্ট্রা ভায়োলেট এবং নীল, হলুদ
ক্রাশটেসিয়াঙ্গ	(ক্রে ফিস)	নীল, লাল
সেফালোপোডা	(অক্টোপাস)	নীল
মাছ		অধিকাংশই দুটি মাত্র রঙ দেখে
উভচর	(ব্যাঙ)	অধিকাংশ কিছু রঙ দেখে
সরীসৃপ	(সাপ)	কিছু রঙ এবং ইনফ্রারেড
পাখী		৫-৭টি রঙ দেখে
স্তন্যপায়ী	(বিড়াল, কুকুর)	২টি রঙ ক্ষীণভাবে দেখে
”	(খরগোস)	নীল ও সবুজ
”	(কাঠবেড়ালি)	নীল ও হলুদ
”	(প্রাইমেট, এপ, আফ্রিকান বাঁদর)	মানুষের মত
”	(দক্ষিণ আমেরিকার বাঁদর)	লাল রঙ ভাল দেখে

প্রকারের। প্রত্যেক প্রকারের নির্দিষ্ট পিগমেন্ট আছে। যার দ্বারা নির্দিষ্ট মানের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি শোষিত হয়। যথাক্রমে –

১) রেড কোন – এরা ৫৮০nm তরঙ্গে দৈর্ঘ্যের আলোর জন্য সবচেয়ে সংবেদনশীল। এরা দীর্ঘ ওয়েভলেন্থ কোন; $L(\lambda)$

২) গ্রিন কোন – এরা ৫৪০nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর জন্য সবচেয়ে সংবেদশীল। এরা মিডিয়াম ওয়েলভলেন্থ কোন; $M(\lambda)$

৩) ব্লু কোন – এরা ৪৫০nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর জন্য সবচেয়ে সংবেদশীল। এরা শর্ট ওয়েভলেন্থ কোন $S(\lambda)$

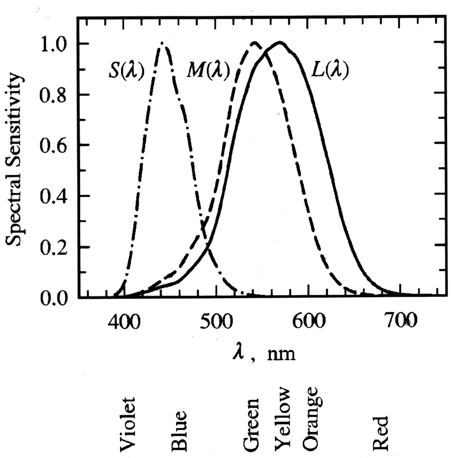

আমাদের চোখের অক্ষি স্নায়ু ও রেটিনার সংযোগস্থলের নিকটে রেটিনার উপর অবিস্থত **চাপ** (arc) ক্ষুদ্র অঞ্চল হলো ফোভিয়া, যা বর্ণ চিহ্নিত করণের জন্য দায়ী। এটি ম্যাকিউলা লিউটিয়া নামক পর্দা দ্বারা আবৃত। যা ফিল্টার রূপে কাজ করে।

জানা দরকার কোনো এক প্রকার **কোন** গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র কোনো একটি নির্দিষ্ট মানের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো দ্বারা উদ্দীপিত হওয়ার তথ্য প্রেরণ করে না। যেমন দেখা গেছে, ৫৭০nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একবর্ণী, দুই একক বিস্তার বিশিষ্ট আলো অনুরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে।

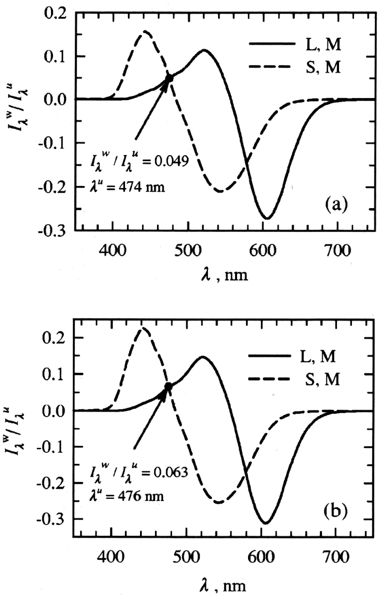

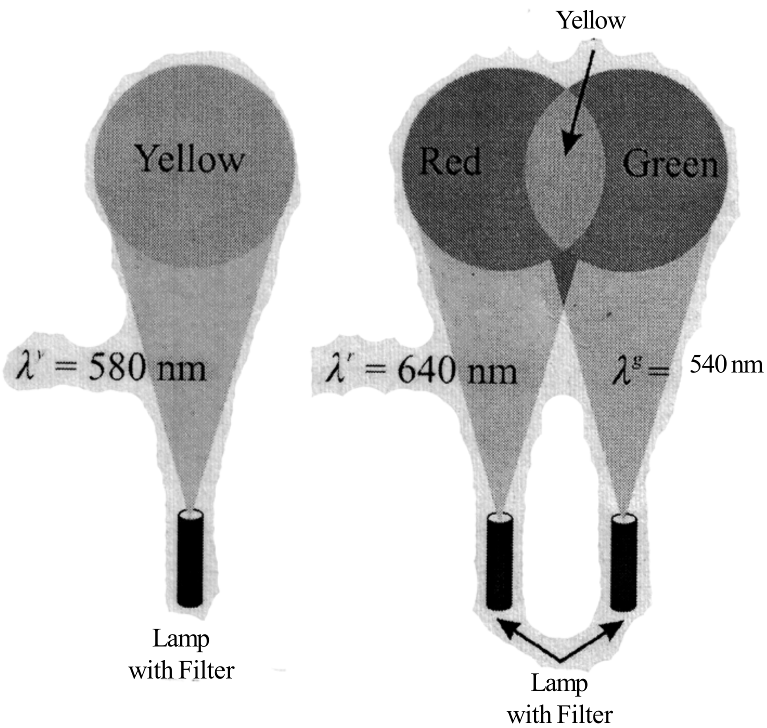

প্রকৃতপক্ষে, বর্ণালী বিক্ষেপণের অনুভূতি তিন প্রকার কোন গ্রাহকের প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত ফলাফল। বিভিন্ন স্পেক্ট্রাল ইরেডিয়েন্স বিশিষ্ট বিভিন্ন আলোক উদ্দীপকের প্রভাবে একই বর্ণ অনুভূতি হতে পারে। যদি উদ্দীপকগুলি একটি নির্দিষ্ট প্রকার কোন কোষকেই উদ্দীপিত করে। এই প্রক্রিয়া **মেটামেরিজম** নামে পরিচিত।

লর্ড রেলাই-এর পরীক্ষায় দেখা যায় লাল আলো ও সবুজ আলোর মিশ্রণ হলুদ আলোর অনুভূতি দেয়। সাদা আলো ও একবর্ণী লাল আলোর মিশ্রণ গোলাপী আলোর উৎপত্তি ঘটায়। অনুরূপে আকাশের রঙ হতে পারে সাদা আলো এবং কোন অজানা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর মিশ্রণের ফল।

বর্ণের উপলব্ধি আসে মস্তিষ্কের ইন্টারপ্রিটেশন দ্বারা। কোনো নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কতগুলি করে ফোটন তিন প্রকার **কোন** কোষের প্রত্যেক প্রকারের রেসপন্স কার্ভের উপর অপতিত হচ্ছে তার উপর। ভিন্ন ভিন্ন রেসপন্স কার্ভগুলি যদি ওভারল্যাপ করে তবে বর্ণের অনুভূতি ভিন্ন হয়। যদি কোনো বর্ণের তীব্র আলোকের প্রভাবে তিন প্রকার **কোন রিসেপ্টর** সম্পূর্ণ রূপে সক্রিয় থাকে তবে সাদা আলো অনুভূত হবে। এই সব ঘটনার দ্বারা বোঝা যায় যে, একাধিক পথে মানুষের চোখ একই বর্ণ অনুভব করতে পারে। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটি মাত্র সমন্বয়ই একটি নির্দিষ্ট বর্ণ অনুভূতির জন্য দায়ী নয়।

দিনের বেলায়, পরিষ্কার আকাশের রঙ যা অনুভূত হয়, সূর্য যখন ভূ-পৃষ্ঠের অনুভূমিক তলের উপরে অবস্থান করে, তা কোনো এক বর্ণের (নীল বা বেগুনী) সমতুল্য নয়। বরঞ্চ যা দেখা যায় তা হলো আলোক বর্ণালীর নীল আলো ও সাদা আলোর মিশ্রণ, যা অসংপৃক্ত নীল বর্ণ রূপে পরিচিত। গবেষণায় জানা গেছে যে স্কাইলাইটের প্রতি মানুষের চোখের যে প্রতিক্রিয়া তা একবর্ণী নীল আলো ও সাদা আলোর মিশ্রণের প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ। মানব মস্তিষ্ক বেগুনী বর্ণ অপেক্ষা স্কাইলাইট-এর প্রতি বেশি সংবেদনশীল।

সবশেষ কথা হলো, আমাদের দর্শন ব্যবস্থা যে বর্ণানুভূতির সৃষ্টি করবে, তা হতে পারে আলোর স্ক্যাটারিং-এর জন্য, হতে পাারে মেটামেরিজম-এর জন্য, তা হতে পারে অন্য কোনও কারণে, আমাদের চোখ সেই বর্ণই দেখবে। এই কারণেই **বিবর্ণ আকাশ আমাদের চোখে – নীলাভ।** ■

অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট ঃ

পোকার আক্রমণে কুলতলীর কৃষকরা সর্বস্বান্ত
ক্ষতিপূরণের দাবিতে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চলছে

"আপনাদের এখানে ঢোকার অনুমতি কে দিলো?" আমাদের দিকে আঙুল তুলে – "একি! ফটো তুলছেন কেন? আপনারা সবাই বেরিয়ে যান এখুনি এখান থেকে। নইলে পুলিশ ডেকে বার করে দেবো।"

"আমরা চাষিরা না খেতি পেয়ে মারা যাচ্ছি, বিঘার পর বিঘা জমি ধানের বদলে খড়ে ভর্তি, আর আপনি আমাদের সাথে এই ব্যবহার করছেন?" গর্জে ওঠে এক ক্ষুব্ধ চাষির কণ্ঠস্বর। পিছন থেকে এক ঠাকুমা সহ মেয়েরা চিৎকার করে বলে ওঠে – "আজ আমরা এই খড় দিয়ে বিডিও অফিস জ্বেইলে রেখে যাবো।"

"আমরা কি কুকুর ছাগল নাকি? ... কতবার তাড়াবে আমাদের! একটা বিহিত করে তবেই যাবো।"

বিডিও সাহেব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন, এবং কিছুক্ষণ পর অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে বলেন – "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা সবাই মিলে হট্টগোল করবেন না, আপনাদের চার পাঁচ জন প্রতিনিধি ভেতরে এসে কথা বলুন, বাকিরা না হয় বাইরে দাঁড়ান। শান্ত ভাবে আলোচনা করুন।"

সাথে সাথে তথাকথিত (শিক্ষিত লোকের ভাষায়) সেই অশিক্ষিত, অভদ্র কৃষক জনতা বিডিও সাহেবের কথার মান রেখে দরজার বাইরে চলে গেলো আর তাদের চার পাঁচ জন প্রতিনিধি সামনের চেয়ারে বসলো, আমরাও চেয়ারে বসলাম।

পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগে উপরিউক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট একটু খোলসা করে নেওয়া যাক। দক্ষিণ ২৪ পগরণার জয়নগর ২ নম্বর ব্লকে চুপড়িঝোড়া, মনিরতট, গাবতলা, নলগড়া, অভয়নগর, মোল্লাপাড়া, খড়িবাড়ি সহ আরো বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চাষিরা বর্ষার যে ধান লাগিয়েছিল তা এক বাদামী শোষক পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। মাঠ কে মাঠ, বিঘার পর বিঘা জমিতে ধানগাছ খড়ে পরিণত হয়ে যায়। ধানে পোকা লাগা মাত্রই কৃষকরা স্থানীয় বিডিও অফিসে এবং পঞ্চায়েতে জানান। কারণ এরকম পোকার আক্রমণ তারা আগে দেখে নি। লিখিত ভাবেও তাদের সমস্যার কথা জানান অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখ। কিন্তু না প্রশাসন না পঞ্চায়েত কেউই কোনো কর্ণপাত করেনি তাদের কথায় বরং বিডিও অফিস থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কৃষকরা চোখের সামনে রক্ত-ঘাম ঝড়ানো ফসল নষ্ট হতে দেখে কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে স্থানীয় দোকানদারের কাছ থেকে পোকা মারার ওষুধ দিতে থাকে দু-তিন বার ধরে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি তাতে। সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। মাঠে হাওয়ায় দুলতে থাকে 'সোনালী খড়'। শেষে চুপড়িঝাড়া অঞ্চলের চাষিরা দলমত, জাতিধর্ম নির্বিশেষে একজোট হয়ে ক্ষতিপূরণের দাবিতে জয়নগর ২ নম্বর বিডিও অফিসে গণ-সাক্ষর করে আবেদন পত্র জমা দিতে যায় গত ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে। সাথে নিয়ে যায় বোঝাই করা খড়। ইতিমধ্যে 'বিজ্ঞান মনস্ক'র সাথে তারা যোগাযোগ করেন এবং সহযোগিতার কথা বলেন। 'বিজ্ঞান মনস্ক' সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নেয় সেই বিষয়ে তদন্ত করার ব্যাপারে। সেই উপলক্ষে সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা ক্যামেরা নিয়ে হাজির হই গত ৩০শে ডিসেম্বর জয়নগর ২ ব্লকের বিডিও অফিসে।

বেলা বারোটা নাগাদ মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে কুলতলী থানার প্রায় শখানেক কৃষক মাথায় বোঝাই করে খড় নিয়ে হাজির হয় বিডিও অফিসের সামনে। কাছে গিয়ে যখন তাদের অবস্থা জানতে চাইলাম – তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন সবাই। বলতে থাকেন কিভাবে বিডিও তাদের তাড়িয়ে দেন, সময় থাকতে তারা খবর দিয়েছেন এমনকি লিখিত অবেদনপত্র জমা দিলেও কোনো কর্ণপাত করা হয় নি। পঞ্চায়েত সদস্য সহ এমএলএ, এমপি কেউই ন্যূনতম খোঁজখবরটুকুও নেন নি। আজ তারা স্বর্বশান্ত, নিশ্বেষিত, কিভাবে সংসার চালাবেন তাই ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছেন না। সে জন্য আজ তারা ক্ষতিপূরণের দাবিতে মরিয়া।

যাই হোক এর পর আমরা সবাই মিলে বিডিও সাহেবের পিএ'র অনুমতি নিয়ে বিডিও সাহেবের ঘরে ঢুকলাম। সাথে সাথে বিডিও সাহেবের প্রতিক্রিয়ার কিছু নমুনা ও কথোপকথন

এই লেখার শুরুতেই তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমে বিডিও সাহেব রাগে অগ্নিশর্মা হলেও চাষিদের ভিতরের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ তাকে দ্রুত ঠান্ডা হতে সাহায্য করে। এরপর তিনি ব্লক সভাপতির সামনেই বৈঠক শুরু করেন।

আলোচনার শুরুতেই বিডিও সাহেব নিজেকেও একজন চাষির ছেলে বলে দাবি করেন এবং বলেন – তিনি ব্যাপারটা সম্পর্কে অবহিত আছেন ও কৃষি মেলায় এটা আলোচনাও করেছেন। তবে সরাসরি ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যাপারে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তিনি এখনই কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন এরকম কথা দিচ্ছেন না। তবে অন্যভাবে চাষিদের যাতে সাহায্য করতে পারেন সে ব্যাপারে তিনি দেখবেন। আগামী দিনে যাতে এরকম ক্ষতি না হয় তা জন্য কে.ভি.কে.'র (কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র) বিজ্ঞানীরা চাষিদের যাতে প্রশিক্ষণ দেন, তিনি তার ব্যবস্থা করে দেবেন। আর পৃথক পৃথক ভাবে চাষিদের ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে ও তার একটা লিস্ট যত দ্রুত সম্ভব জমা দিতে বলেন। এবং পরদিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর চাষিদের মধ্যে পাঁচ জন প্রতিনিধি ও আমাদের আসতে বলেন।

বিডিও সাহেবের সাথে আলোচনা শেষ করে চাষিরা গ্রামের দিকে রওনা হন ও আমাদের অনুরোধ করেন তাদের করুণ অবস্থা একবার নিজের চোখে দেখে যাবার জন্য। সেই দিন বেলায় বেলায় আমরা প্রথমে মোল্লাপাড়া ও পরের দিন অভয়নগর ও তার সংলগ্ন গ্রামগুলির মাঠে মাঠে ঘুরতে থাকি।

পৌষের ঠান্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায় যে সোনালী ধানের শীষ মাথা দোলায়, যা দেখে চাষি বৌয়ের দুচোখ স্বপ্নে ভরে ওঠে, সেই চোখে ধানের শীষের বদলে খড়, কাঁটার মত বিধতে থাকে।

"মহাজনের টাকা শোধ দেবো কী করে? ...

"পেটের আগুন নিভবে কী করে? ...

"স্বামী শয্যায় – আমার সামনে অপারেশন, কী করে হবে কে জানে! ..." বলতে বলতে চোখ চকচক করে ওঠে নমিতা গায়েনের। কেউ বলছেন "এবার ঘর ছেড়ে পালাতে হবে।" এই হচ্ছে সামগ্রিক পরিস্থিতি। জনে জনে কৃষকরা তার মাঠের পর মাঠ খড় দেখিয়ে এইসব কথা বলছেন। আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হলো এই খড় কাটতেও জন প্রতি টাকা খরচ হবে। আর ঐ খড় গরুও মুখে নিচ্ছে না।

"তবে আমরা হাল ছাড়বো না বুঝলেন। এবার এর একটা বিহিত করেই ছাড়বো"- সমস্বরে বলে উঠলেন বিকালে সমবেতন হওয়া চাষিরা। "কতদিন আমরা ফলিডল খাবো? এবার আমাদেরও বুঝে নিতে হবে" – বলে ওঠেন ইসলাম ভাই।

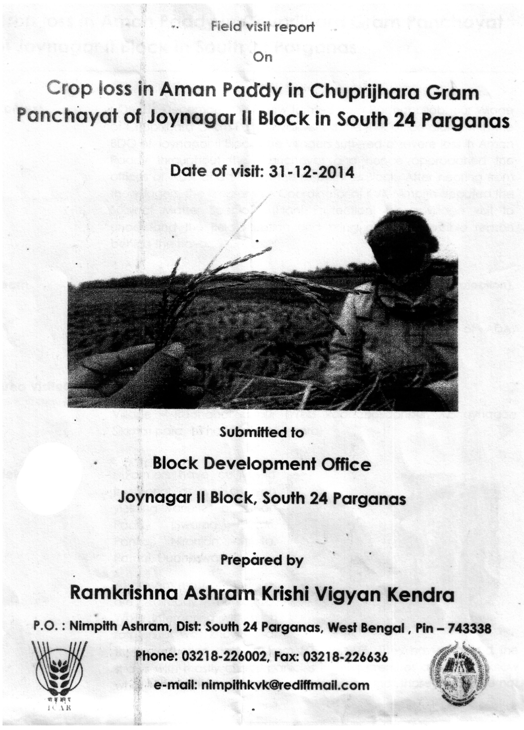
Field visit report

On

Crop loss in Aman Paddy in Chuprijhara Gram Panchayat of Joynagar II Block in South 24 Parganas

Date of visit: 31-12-2014

Submitted to

Block Development Office

Joynagar II Block, South 24 Parganas

Prepared by

Ramkrishna Ashram Krishi Vigyan Kendra

P.O.: Nimpith Ashram, Dist: South 24 Parganas, West Bengal, Pin – 743338

Phone: 03218-226002, Fax: 03218-226636

e-mail: nimpithkvk@rediffmail.com

সবাই মিলে একমত হয়ে তারা গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিলেন 'চাষি সমিতি' যা দলমত, জাত-ধর্ম নির্বিশেষে হবে। এরপর তারা হিসাব করতে বসলেন কত ক্ষতি হয়েছে তাদের। দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় তারা নিজেদের শ্রম, বাড়ির মেয়েদের শ্রম যারা কিনা ভোলবেলা থেকে মাঠে ধান রোয়া, ধান ঝাড়াই-মাড়াই প্রভৃতি করে থাকেন, এসবের মজুরি তারা ধরেনই না। তারা শুধু বীজ কেনা, সার কেনা, কীটনাশক কেনা, জল সেচের খরচ ইত্যাদিই হিসাবের মধ্যে ধরেন। মহাজনের কাছে সেই বাবদ কত ঋণ হয়েছে তারই হিসাব রাখেন। যাই হোক তাদের শ্রম বাদ দিয়েই বিঘে প্রতি ৫৪০০ টাকা ক্ষতির একটা হিসাব করেন।

পরের দিন সকাল অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর বিডিও সাহেব আমাদের কেভিকে-তে পাঠান এবং নিজেও উপস্থিত হন সেখানে। আমাদের তোলা ছবি দেখে তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যান কিরকম ক্ষতি হয়েছে। কেভিকে'র আধিকারিকও জানান ক্ষতিপূরণ দেবার কোনো ক্ষমতা তার নেই। তবে কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দেবার ব্যাপারে তিনি সাহায্য করতে পারেন। বিডিও সাহেব এরপর তার সাথে আলোচনা করে তৎক্ষণাৎ কৃষি বিজ্ঞানী ও বিডিও সাহেবের

প্রতিনিধি সহ গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন – যাতে গোটা ব্যাপারটা সরজমিনে তদন্ত করে একটা তদন্ত রিপোর্ট তৈরী করা যায়, যত দ্রুত সম্ভব। তদন্ত করার জন্য অফিসাররা ঐ দিনই সাথে সাথে গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পরেন। এরপর তারা মাঠে মাঠে ঘুরে তদন্ত করেন, খড়ের নমুনা, মাটির নমুনা সংগ্রহ করেন, ছবি তোলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই একটা সরকারি রিপোর্ট তৈরি হয়। সেই রিপোর্টের কপি চাষি-সমিতি সহ 'বিজ্ঞান মনস্ক-কেও দেওয়া হয়। (চিত্র)

সেই সরকারি রিপোর্টে বলা হয়, জয়নগর ২ (নিমপিঠ), কুলতলি (জামতলা) সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবছর শরতের শেষে 'বাদামী শোষক পোকা'র আক্রমণে বিভিন্ন জমিতে শতকরা ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এই পোকার আক্রমণ এই অঞ্চলে নতুন। তাই প্রচলিত কীট নাশক ব্যবহার করে তা রোধ করা সম্ভব হয় নি। সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ ছাড়া এই পোকার আক্রমণ রোধ করা সম্ভব নয়।

প্রথম প্রথম যে সব চাষি কী হবে এসব করে, তারা তো মারই খাবেন, আদৌ কি ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে?, যদিও বা পাওয়া যায় তাতে পঞ্চায়েত সদস্য সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকেদের পেট মোটা হবে ইত্যাদি ভেবে দূরে সরে ছিলেন তারাও ক্রমশ 'চাষি সমিতি'র একতার জোর দেখে বুকে ভরসা পেতে লাগলেন। অবশ্য তাদের এই ধরণা যে ভ্রান্ত তা মোটেই নয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই তারা এমন ভেবেছেন। এর আগে এই অঞ্চল 'আয়লায়' ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আয়লা'র সেই ক্ষতিপূরণের টাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী সদস্যদের শ্রী বৃদ্ধির আর নিজেদের দুর্দশার অভিজ্ঞতা তাদের ভালই মনে আছে। যাই হোক, এক এক করে আস্তে আস্তে বাড়ছে এই সমিতির ব্যাপ্তি। লাগোয়া আরও অন্যান্য গ্রাম থেকে লোকে যোগাযোগ শুরু করলো। নিজেরা জোটবদ্ধ হতে থাকলো। বিজ্ঞান মনস্ক ধারাবাহিক ভাবে তাদের পাশে থেকে কাজ করতে লাগলো। চুপড়িঝোড়া, মনিরতট, গাবতলা প্রভৃতি গ্রামে ঘুরে ঘুরে রিপোর্ট তৈরী করতে লাগলাম আমরা।

অনেক টালবাহানার পর এডিও সাহেব গত ৬ই ফেব্রুয়ারি কৃষকদের সাথে এবং সহযোগী অন্যান্য সংগঠন সহ বিজ্ঞান মনস্ক'র সাথে বৈঠক করেন। প্রথমেই তিনি স্বীকার করে নেন যে সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র ব্লকে গড়ে ৭০ শতাংশেরও বেশি ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এই অঞ্চলে এটা নতুন রোগ। তবে এর থেকে বাঁচার বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। তার জন্য চাষিরা যাতে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ পান তার ব্যবস্থা করবেন। তিনি আরও বলেন, এই ব্লকের কৃষকদের ক্ষতিপূরণের জন্য দু কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সরকারের কাছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসাবে এই টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব। কারণ সরকারি নিয়মে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব। তাবে সাথে সাথে সংশয় প্রকাশও করেন, বলেন, ঐ টাকা চাষিরা পাবেন কিনা! কারণ তার জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড থাকা প্রয়োজন, চাষিরা তখন এ-ওর মুখ চাওয়া-চাষি করতে থাকেন। নতুন কথা তাদের কাছে। মাত্র একজন ছাড়া উপস্থিত ৭০-৭৫ জন চাষির কারোর সেই কার্ড নেই। তারা কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এডিও সাহেব তখন বলেন ঐ ব্যক্তিই ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। তবে তিনি সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষি সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করতে পারেন মাত্র। তখন কৃষক সমিতির প্রতিনিধি বলে ওঠেন – 'এই কার্ড করানোর দায়িত্ব কার? আমরা কৃষকরা জানবো কী করে? আমরা ভিক্ষা চাইতে আসিনি। অধিকার চাইতে এসেছি। কৃষক সমিতির চাষিরা এরপর তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন জেলা ও রাজ্যস্তরের সরকারি বিভাগে ক্ষতিপূরণের দাবীপত্র পেশ করেন। স্থানীয় ভাবে পঞ্চায়েত, বিধায়ক, এমপি প্রভৃতি জনপ্রতিনিধির ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।

এরপর গত ২১শে ফেব্রুয়ারী অভয়নগর গ্রামে কৃষক সমিতির ডাকে বেলা একটা থেকে রোদ মাথায় নিয়ে এক এক করে ব্যাপক কৃষক জমায়েত হন অভয়নগর গ্রামে। ইতিমধ্যে ঐসব অঞ্চলে আবার নতুন বিপর্যয় শুরু হয়েছে। গরমে সমস্ত শ্যালো পাম্প বসে যাচ্ছে। 'এবার গরমের চাষটাও মার খাবে' বলে হা-হুতাশ করতে থাকে কৃষকরা। কুলতলীর বিধায়ক ভোটে জেতার আগে কথা দিয়েছিলেন ডায়মন্ডহারবার থেকে মিষ্টি জলের খাল কেটে আনার, তা তো আজ বিশ বাঁও জলে! এরপর সভায় উপস্থিত হয়ে কৃষকরা একে একে বলতে থাকেন – "আমাদের পয়সার এত সরকারি দপ্তর খুলে রাখার কারণ কি যদি কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া যায়? ..." "আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে। কোনো কার্ড-ফার্ড জানি না ...।" "আমরা এই লড়াইয়ের শেষ দেখেই ছাড়বো ...।" "গ্রামে গ্রামে চাষিরা জাত-ধর্ম-পার্টিতে ভাগ হয়ে আছে। এই 'কৃষক সমিতি'র এই সব বিভেদ ভুলে চাষিদের অধিকারের দাবিতে জোটবদ্ধ হতে জন্ম হয়েছে ...।" "অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামবো না ...।"

মাঠ ভর্তি ধান গাছ কিন্তু ধান নেই, হতাশ কৃষকরা

কৃষকরা বিধায়কের কাছে দাবিপত্র পেশ করছেন

কুলতলীর বিধায় রামশঙ্কর হালদারকে এই সমিতি আগেই চিঠি দিয়ে তাদের সমস্যার কথা ও এই সভাতে উপস্থিত হবার কথা জানিয়েছিলো। তিনি উপস্থিত থাকবেন কথাও দিয়েছিলেন কিন্তু ঐ দিন সকাল থেকেই তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলো না। কিন্তু চাষিদের ক্ষোভের চাপে একপ্রকার বাধ্য হয়েই তিনি বেলা চারটে নাগাদ উপস্থিত হন। তিনি তার অত্যন্ত সুকৌশলী বক্তব্যের মাধ্যমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই ক্ষতির জন্য চাষিদেরই দায়ী করেন। বলেন আসলে কৃষকদের অজ্ঞানতার কারণে, বেশি লোভ করতে গিয়ে, বেশি বেশি সার, কীটনাশক ব্যবহার করার কারণে অনেক সময় ফসল নষ্ট হয়। তবে চলতি বিধানসভার অধিবেশনে তিনি এই প্রসঙ্গ তুলবেন এবং কৃষকদের লড়াইয়ের পাশে থাকবেন।

বিধায়কের বক্তব্যে মৃয়মান কৃষকদের উদ্দেশ্যে এরপর বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিনিধি বলেন – সরকারি রিপোর্ট বলছে যে – এটা নতুন ধরনের পোকা। তাই বিনা প্রশিক্ষণে চাষিরা এর মোকাবিলা করবেন কীভাবে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড না থাকলে চাষিরা ক্ষতিপূরণ পাবেন না। কিন্তু কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করার দায় কার? এই দায় তো জনপ্রতিনিধির, প্রশাসনের। এই পঞ্চায়েত, বিধায়ক, এমপি সহ জনপ্রতিনিধিরা এবং প্রশাসন চলে সমগ্র কৃষক ও শ্রমিকের করের টাকায়। শুধু প্রত্যক্ষ কর নয় অপ্রত্যক্ষকরই হচ্ছে সরকারি রাজস্বের প্রধান অংশ, যা আমরা প্রত্যেকদিন যা কিছু কেনাকাটি করি তার একটা অংশ। জনগণের টাকাতেই মাননীয় বিধায় সহ জনপ্রতিনিধিরা ভাতা পেয়ে থাকেন। তাই ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, এলাকায় সেচের ব্যবস্থা, কৃষির হাজারো সমস্যার সমাধান অবিলম্বে বিধায়ক সহ সকল জনপ্রতিনিধিদের করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের জোটবদ্ধ আন্দোলনের পাশে বিজ্ঞান মনস্ক আছে এবং থাকবে। কৃষকরা বিধায়ককে ঘিরে তাদের দাবিপত্র পেশ করেন।

সেই ঘটনা থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমশ চাষিদের এই সমিতি আরো জোরালো হচ্ছে। বিডিও, এডিও কোনো সরকারি অনুদান এলে সমিতির সাথে যোগাযোগ করে দিয়ে থাকেন এবং কৃষক সমিতির লোকেরা বৈঠক করে সকলের সম্মতি নিয়ে গরীব ক্ষতিগ্রস্থ চাষিদের মধ্যে তা বিলি করে দেন। চাষিদের একতার জোর বাধ্য করেছে নেতাদের এবং পেটোয়া লোকেদের পিছু হটতে।

বর্তমানে কুলতলীর এই কৃষক সমিতির সামনে অনেক কাজ। আমরা লক্ষ্য করেছি ধর্ম, জাতি, দল এই চাষিদের মধ্যে কোনো ভাঙন ধরাতে পারে নি। ভাগ্যের বদলে কোথায় যেন তারা তাদের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করছেন যে ভাগ্য নয়, সমাজ ব্যবস্থাই তাদের দৈন্যদশার জন্য দায়ী। তাই তারা আমাদের মত বিজ্ঞান সংগঠনের কাছে বুঝতে চেয়েছেন এই পরিস্থিতি কাটাবার সঠিক বৈজ্ঞানিক পথ কী? তারা বুঝতে চেষ্টা করছেন প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার বদলে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা হয় কী করে। দলবাজি রুখে একতাবদ্ধ লড়াই সংগ্রামের পথ কী? এরই প্রতিফলন দেখতে পাই এই কৃষক সমিতির এক প্রতিনিধির কণ্ঠে – "আমরা যদি ক্ষতিপূরণ না পাই তবে সমস্ত কর দেওয়া আমরা বন্ধ করে দেবো। এই ব্যবস্থা যদি আমাদের অধিকার না দিতে পারে তবে খেটে খাওয়া কৃষক-শ্রমিক – আমরাই আমাদের ব্যবস্থা গড়ে তুলবো।" ■

রিপোর্ট

বনগাঁয় মৌলবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

গত ৩রা মে বুধবার ২০১৫ বেলা ৪ ঘটিকায় উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ পাবলিক লাইব্রেরির সভাগৃহে সেমিনার ও ৮ই মে শুক্রবার ২০১৫ বনগাঁ বাটা মোড়ে প্রতিবাদী পথসভা হয়েছে, বিষয় “মৌলবাদী আগ্রাসন বনাম মুক্তিচিন্তা ও মানবাধিকার”। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, মুক্তধারা শিল্পগোষ্ঠী, এআইপিএসএফ, এপিডিআর (বনগাঁ শাখা)র উদ্যোগে এই সভাগুলি হয়েছে। ‘বিজ্ঞান মনস্ক’কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ‘বিজ্ঞান মনস্ক’ গত ৮ই মে’র পথসভাটিতে উপস্থিত ছিল।

বিকাল ৫.৩০ মি.-এ পথসভা শুরু হয়। প্রথমে মুক্তধারা’র পক্ষ থেকে বলা হয়, কিভাবে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের হাতে অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমান বাবু এবং এই দেশে বিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত নরেন্দ্র দাভালকারকে হত্যা করা হয়। ভারতে হিন্দু মৌলবাদ ও মুসলিম মৌলবাদ এই দুই-ই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সারা পৃথিবীতেও একই অবস্থা আজ। পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু যুগে তাদের দর্শন, তাদের ধারা, তাদের সংস্কৃতি সমাজের অগ্রগিতর পক্ষে বাধা। পুঁজিবাদের ফসল মৌলবাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে। সঞ্চালক ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির শ্রী গণেশ ঘোষ বলেন – পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের অনেক পরে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আবির্ভাব হয়, আর তারও অনেক পরে আবির্ভাব হয় মৌলবাদের। ১৮৭৮ সালে নায়েগ্রায় এক ধর্ম সম্মেলনের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল প্রথম। তারপর একে একে বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পরে। এই মৌলবাদীদের আক্রমণে প্রগতিশীল মুক্তধারার মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছেন বা মারা যাচ্ছেন। ভারতের সংবিধানে উল্লেখ আছে ‘ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র’। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় রাষ্ট্র কোনও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। ধর্ম হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু দুঃক্ষের বিষয় আমাদের দেশে আমরা সকল ধর্মের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে গিয়ে আসলে মৌলবাদকেই পুষ্ট করি।

এরপর সুঁটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চ থেকে নিহত সমাজকর্মী শ্রী বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা বিশ্বাস তার মর্মস্পর্শী বক্তব্যে বলেন – কিভাবে বরুণ বিশ্বাস নারী নির্যাতন, ধর্ষণের প্রতিবাদ করেন, গরীব নির্যাতিত মানুষদের নিয়ে গড়ে তোলেন প্রতিবাদী মঞ্চ। রাজনৈতিক মদত পুষ্ট সমাজ বিরোধীরা তাকে প্রকাশ্যে খুন ক’রে ও এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দেশে বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীই হোক আর বরুণ বিশ্বাসের মতো সমাজকর্মীই হোক যারাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, নিষ্ঠুর ভাবে তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কিভাবে সাধারণ মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে, প্রতিবাদী মানুষদের দমিয়ে, শেষে খুন করে নেতাগিরি করছে সেটাই আমরা দেখি। তাই তো আজ দেশের সংবিধান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে – এই সব ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে কিভাবে? তাই কারও ওপর ভরসা না করে আমাদের, সাধারণ মানুষদের আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে একজোট হয়ে শক্ত ভাবে সমস্ত মৌলবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে, না হলে মানবতার ধর্ম রুদ্ধ হবে।

পরবর্তী বক্তা নন্দবাবু বলেন যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে ফ্যাসিবাদ চলছে তা আগে মানুষ কখনও দেখেনি। এর বিরুদ্ধে সবাইকে প্রতিবাদে নামতে হবে।

বিজ্ঞান মনস্ক থেকে বলা হয় – এখন ভারতে, বাংলাদেশে যে ভাবে একের পর এক যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে তাই এতো শোরগোল, তবে এই ঘটনা কি নতুন? ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে মৌলবাদ, অলৌকিকবাদ, জাতি-ধর্ম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে যারাই আজ অবধি সরব হয়েছেন, যুগে যুগে তাদের একে, একে হত্যা করা হয়েছে। কোন একটা বিশ্বাসকে অন্ধভাবে অনুকরণ এবং তার বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি, বিশ্বাস, সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে দমন করাকে বলে মৌলবাদী আগ্রাসন। যে বুর্জোয়া শ্রেণী একসময় পিছিয়ে পড়া অন্ধ সামন্ত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও প্রগতিশীলতাকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছিল, একচেটিয়া যুগে প্রবেশ করার পর নিজে টিঁকে থাকার জন্য তারাই আজ দুনিয়া ব্যাপী অন্ধ বিশ্বাস, প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত চিন্তা চেতনাকে হাতিয়ার করেছে। বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে ওঠার প্রতিরোধে হিন্দু মৌলবাদ, মুসলিম মৌলবাদ, খ্রীস্টান মৌলবাদ, ইহুদি মৌলবাদ ইত্যাদি ধর্মীয় মৌলবাদের একের পর এক জন্ম দিয়ে চলেছে। আরব দুনিয়ায় মুসলিম ব্রাদারহুড, আলকায়দার জন্মদাতা কে? প্যালেস্তাইনে জিয়নবাদী

শক্তিদের মদত দিচ্ছে কারা? ভারতে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বাংলাদেশে জামাত-ই-ইসলাম, পাকিস্তানে তালিবান, মায়ানমারে বৌদ্ধ মৌলবাদ, জার্মানি-ফ্রান্স সহ সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকার দেশে দেশে খ্রীষ্টীয় মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষক কারা, আজ প্রমাণিত যে, HSBC, CITI ব্যাঙ্ক ইত্যাদি একচেটিয়া কোম্পানীগুলি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি একসময় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উত্থানকে দমন করতে যে মুসলিম ব্রাদার হুডের জন্ম দিয়েছিল সেই শক্তি আজ ISIS-এর রূপ নিয়ে বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে। হবারই কথা। বর্তমানে সাধারণ মানুষের প্রকৃত সমস্যাকে আড়াল করতেই এই ধর্মীয় উন্মাদনা। আজ মানুষের প্রকৃত সমস্যা কি? আজ মানুষ আর্থিক অনিশ্চয়তা, কর্মহীনতা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সাধারণ মানুষ আজ জানে না কাল তার কি হবে? কাজ থাকবে তো? ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া চালাতে পারবে কি? হঠাৎ যদি কোনো বড় অসুখ হয় তবে চিকিৎসা কি করে করাবে? বাড়ির মেয়েটা বাইরে বেরোলে বাড়িতে ঠিকঠাক ফিরবে তো? আরো আরো বিবিধ নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্নের সে মুখোমুখি। সে যখন কর্মস্থলে যায় তখন কি চিন্তা করে তার সহকর্মীটি কোন জাতের? কোন ধর্মের? যখন শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন করে, জাত-ধর্ম নির্বিশেষেই করে। তাহলে আজকের যুগে যা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের জীবন থেকে সেই জাত-পাত-ধর্মের এতো বাড়-বাড়ন্ত কেন? বর্তমান যুগে মানুষ কোন জাতি-ধর্মে বিভক্ত নয়, বিভক্ত শোষক পুঁজিবাদী শ্রেণী আর শোষিত খেটে খাওয়া শ্রেণীতে। এই চরম সত্য আড়াল করতেই তো মৌলবাদের এত ডঙ্কা। শ্রীমতি প্রমীলা বিশ্বাস সংবিধান সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছেন মনে রাখতে হবে এই সংবিধান, এই রাষ্ট্র পুঁজিপতি শ্রেণীরই তৈরী। তাই তো আমরা দেখি ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে বাধ্য হয়েই, সংবিধান মেনে রামলীলা ময়দানে রাবন পোড়াতে যেতে হয় নিয়ম করে। এখানে মুখ্যমন্ত্রীকে মাথায় ফেট্টি বেঁধে নামাজে বসতে হয়, বিরোধীদের ফুরফুরা শরীফে গিয়ে মনজয় করতে হয়, আরো কত কিই না করতে হয়। সেখানে নরেন্দ্র দাভালকার, বরুণ বিশ্বাসদের তো মরতে হবেই। এই রাজ্যে একের পর এক বানতলা, ধানতলা, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, পার্কস্ট্রীট, সুঁটিয়া ইত্যাদি থেকে দিল্লীর নির্ভয়া প্রভৃতি ঘটনাকে 'এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা' হিসাবে দেখাতেই হয় রাষ্ট্র নায়কদের। সমস্ত ধরনের মৌলবাদের মূল কথা হলো – নারীকে পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসাবে দেখা, বিজ্ঞানের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করা, অনজ্ঞতার বিরুদ্ধে, সামাজিক দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে যে কোন সংগ্রামকে অবরুদ্ধ করা। সুতরাং বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তিবাদী মানুষকে শুধুমাত্র মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেই চলবে না, এর মদতদাতা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হবে। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নামতে হবে, নতুবা মৌলবাদকে উৎস থেকে নির্মূল করা যাবে না।

আশিষ চক্রবর্তী বলেন পূর্ববর্তী বক্তারা বললেন যে মৌলবাদ মানেই ধর্মীয় গোঁড়ামির ব্যাপার, তা নয়। মৌলবাদের জন্ম ফ্যাসিবাদ থেকে। নিজের মত ছাড়া অন্যের মতকে গুরুত্ব না দেওয়া, অসহনশীলতা, অসহিষ্ণুতা এবং এই অসহিষ্ণুতার বশবর্তী হয়ে আগ্রাসন হলো মৌলবাদী আগ্রাসন, তা পারিবারিক প্রেক্ষাপটে হতে পারে, পাড়ার প্রেক্ষাপটে হতে পারে, দুনিয়া জুড়ে হতে পারে। সব জায়গাতেই অসহিষ্ণুতা, অন্যের মতকে পাত্তা দেব না, গুরুত্ব দেব না, আমি যা বলছি এটাই চূড়ান্ত মত, আমার বিপরীতে সমস্ত কথা খন্ডন করা, মিথ্যা কথা বলা তাতেও যদি না হয় তবে দমন করা এটাই মৌলবাদী আগ্রাসন।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই যে মৌলবাদ নির্মূল হবে এটাও এক ভ্রান্ত ধারণা। পৃথিবীর ৫টা দেশে আজ সমাজতন্ত্র আছে কিন্তু সেখানে গণতন্ত্রের গলা কিভাবে টিপে ধরা হয়েছে তা আমরা আজ দেখতে পাই। উত্তর কোরিয়ার মানুষের আজ কি অবস্থা তা সবারই জানা, তাই সমাজতন্ত্র হলেই মৌলবাদ শেষ হবে এটা ভুল। আমরা যদি কর্মের, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের এই তিনটি দাবীতে এক হতে পারি তবেই মৌলবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে পারব।

এ আই পি এস এফ-এর বক্তা বলেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণ নিপীড়ন টিকিয়ে রাখতে যুগে যুগে শাসকশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শকে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। সত্যের সন্ধানে যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের উপর নৃশংস হামলা ও প্রাণনাশের মত ঘটনা ঘটেছে। তবুও প্রতিবাদের আগুন নিভে যায় নি। এই মৌলবাদী আগ্রাসন কোন দেশ বা ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সবর্ত্র এই ঘটনা ঘটছে। মৌলবাদকে উচ্ছেদ করতে তার উৎসের বিরুদ্ধে (বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার) সংগ্রাম করতে হবে। এই লক্ষ্যে আমাদের একতাবদ্ধ হতে হবে।■

বিজ্ঞানের খবর

নভেম্বর, ২০১৪

২❖ বিজ্ঞানীরা লিপিড থেকে কৃত্রিম ন্যানোপার্টিকলের জন্ম দিয়েছে যা দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম এবং একই সাথে তা অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্টান্ট হওয়াকেও প্রতিরোধ করে। (সায়েন্স ডেইলি)

৫.❖ আমলা টেলিস্কোপ প্রথম একটি প্রোটোপ্লানেটেরি ডিস্ককে দেখতে পেয়েছে। এই ছবিতে একসারি গোলাকার রিং দেখা গেছে যা নতুন প্লানেটের জন্মমুহূর্তে দেখা যায়। (আমলা)

❖ কোষের প্রোটিনকে কেন্দ্র থেকে কোষপর্দার দিকে যাওয়ার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে এক বিশেষ প্রযুক্তির দ্বারা। এই জৈবনিক প্রক্রিয়া সবরকম ক্যানসারের তিনভাগের একভাগের কারণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই আবিষ্কার ব্রিটেনের লিভারপুলে অনুষ্ঠিত ক্যানসার কনফারেন্সে উল্লেখ করা হয়েছে। (ক্যান্সার রিসার্চ, ইউকে)

❖একপ্রকার কৃত্রিম অনুচক্রিকা (প্লেটলেটস্) তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যা দিয়ে কোন ক্ষতস্থানের রক্তপাত ৩গুণ দ্রুত বন্ধ করা সম্ভব। এই কৃত্রিম অনুচক্রিকার আকার ও আয়তন মানুষের রক্তের প্রকৃত অনুচক্রিকার মত। (ইউরেকালার্ট)

৭.❖সুইডেনের বিজ্ঞানীরা পারকিনসনস্ রোগের চিকিৎসায় এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে। তাঁরা ইঁদুরের শরীরের নিউরনকে বাঁচাতে স্টেম সেলের ব্যবহার করে এই সাফল্য পেয়েছেন। মানুষের শরীরে এই পরীক্ষা ২০১৭ সাল নাগাদ হবে। (বিবিসি)

❖নাসা জানিয়েছে যে গত ১৯শে অক্টোবর মঙ্গলগ্রহের পাশ দিয়ে একটি উল্কা চলে গেছে যার উপাদান হল ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, নিকেল, ক্রোমিয়াম এবং জিঙ্ক দিয়ে গঠিত। এই উল্কাটির আকার অনুমানের তুলনায় ছোট এবং তা মঙ্গলকে বছরে ৮ বার প্রদক্ষিণ করে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১২.❖ইরানের ন্যানোটেকনোলজিস্টরা স্তন ক্যান্সার চিকিৎসায় curcumin ন্যানো ড্রাগের ব্যবহারকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে সাফল্য পেয়েছেন। (নাসা)

❖রোসেট্রা স্পেস ক্রাফট থেকে ফিলি ধূমকেতুর উপর অবতরণ করা হয়েছে। এই ধূমকেতুর বৈজ্ঞানিক নাম ৬৭পি/চুরিউমভ - জেরাসিমেঙ্কো। (ইউকোলার্ট)

১৮.❖ ফিলি ধূমকেতুতে জৈবযৌগের উপস্থিতি মিলল। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

২৪.❖ সমুদ্রের জলের নীচে কর্মরত রোবোটের সাহায্যে এই প্রথম আন্ট্রার্কটিকা সাগরের হিমশৈলের একটি খুঁটিনাটি ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়া গেছে। (ব্রিটিশ আন্টার্কটিক সার্ভে)

❖সম্প্রতি প্রায় বিলুপ্ত হওয়া সাপ রিভার সকে সলমন'র সংখ্যার যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রকৃতিতে টিঁকে থাকার অবস্থায় পৌঁছেছে। (সায়েন্স ডেইলি)

২৬.❖ ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটনকে গ্রাফিনের মধ্য দিয়ে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। অতীতে হাইড্রোজেন সহ কোন গ্যাসের মধ্য দিয়ে তা পাঠানো সম্ভব হয় নি। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে পরমাণু শক্তি উৎপাদনে বড় ভূমিকা নেবে। (নেচার)

❖ফেস ১ ক্লিনিকাল ট্রায়ালে ইবোলা রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কারের প্রথম ধাপ সফল হয়েছে। (সায়েন্স ডেইলি, বিবিসি)

❖একটি নতুন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে কোষের ডি এন এ মহাকাশে ঘুরে আবার পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে এলেও জেনেটিক তথ্য দিতে পারে। এই গবেষণার ফল দেখায় যে জৈব যৌগগুলি এবং জীবন এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যেতে পারে উল্কার সাহায্যে। (সায়েন্স ডেইলি)

ডিসেম্বর, ২০১৪

১.❖ মাংসাশী উদ্ভিদের প্রথম জীবাশ্ম, যা কিনা ৩৫ থেকে ৪৭ মিলিয়ন বছর পুরানো এবং **রোরিডুলা** প্রজাতির পূর্বপুরুষ আবিস্কৃত হল (বিবিসি)

❖ইতালির ফেরারাতে উপস্থিত অ্যাস্ট্রোনমার প্লাঙ্ক ২০১৪ রিপোর্ট করেছে যে মহাবিশ্বের বয়স ১৩.৮ বিলিয়ন বা ১৩৮০ কোটি বর্ষ এবং তা ৪.৯ শতাংশ অ্যাটমিক ম্যাটার, ২৬.৬ শতাংশ ডার্ক ম্যাটার এবং ৬৮.৫ শতাংশ ডার্ক এনার্জি দ্বারা গঠিত। (নিউ ইয়র্ক সায়েন্স)

❖ এই প্রথম ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং ব্যবহার করা হল সেমিকন্ডাক্টর এবং অন্যান্য পদার্থ দিয়ে তৈরি ইলেকট্রনিক সার্কিটের ব্যবহার বোঝার জন্য। (টেকনলজি রিভিউ)

❖সিনথেটিক বায়োলজির সাহায্যে বিশ্বে প্রথম কৃত্রিম এনজাইম প্রস্তুত হল। (phys. org)

৪.❖ জিকজ্যাক আকারের অস্ত্র আবিস্কৃত হল যা কিনা মানুষের পূর্বপুরুষের তৈরি প্রাচীন খোদাই করা জিনিস। (বিবিসি)

৫.❖ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্কাইভগুলি ঘোষণা করেছে যে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের গবেষণাপত্রগুলি– ৩০ হাজারের বেশি বিশিষ্ট ডকুমেন্ট যা এখন থেকে 'ডিজিটাল আইনস্টাইন' নামক অনলাইন ব্যবস্থায় পাওয়া যাবে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১০.❖ বিজ্ঞানীদের মতে ধূমকেতু ৬৭পি / চুরিইউমভ - জেরাসিমোঙ্কো-তে প্রাপ্ত জলীয় বাষ্প'র উপাদান পৃথিবীর জলীয় বাষ্পের থেকে ভিন্ন। পৃথিবীতে প্রাপ্ত জলের তুলনায় এই জলীয়

বাষ্পে ডয়টেরিয়াম / হাইড্রোজেনের অনুপাত তিনগুণ বেশি। (নাসা)

১৬.❖ নাসা জানিয়েছে যে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমন্ডলে মিথেনের অনুপাত প্রথমে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে তারপর কমে গেছে। কিউরিওসিটি রোভার মঙ্গলের পাথর খনন করে তাতে জৈব রাসায়নিকের উপস্থিতি পেয়েছে। (নাসা)

১৯.❖ অতীতে জানা ছিল সমুদ্রের ৫০০ মিটার (১৬০০ ফুট) গভীর পর্যন্ত মাছের প্রজাতি পাওয়া যায়। বর্তমানে মারিয়ানা ট্রেঞ্চে ৮১৪৫ মিটার (২৬,৭২২ ফুট) গভীরেও মাছের প্রজাতি পাওয়া গেছে। (বিবিসি)

২৪.❖ বিজ্ঞানীরা ৩০০ মিলিয়ন বছরের প্রাচীন মাছের জীবাশ্মে রড কোষ এবং কোন কোষের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছেন। এটাই হল সবচেয়ে প্রাচীন মেরুদন্ডী প্রাণীর প্রোটোরিসেপ্টর যা অতীতে আবিস্কৃত হয়নি। (নেচার)

২৬.❖ মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি ঘোষণা করেছে যে তারা একটি ডি এন এ ব্যাঙ্ক তৈরি করছে যাতে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সকল জীবের জেনেটিক উপাদান তাতে সংগৃহীত করবে। এই ব্যাঙ্কটি ২০১৮ সালে সকলের জন্য খোলা হবে। (আর. টি)

জানুয়ারি ২০১৫

২. ❖ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স-এর অধ্যয়ন বিষয়ক পত্রিকা 'সায়েন্সে' প্রকাশিত হয়েছে যে একটি প্রোটিন আরেকটি প্রোটিনের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হতে পারে কোনও জিনগত নির্দেশ ছাড়াই। আর. কিউ. সি. ২ নামক একটি প্রোটিন, যা ঈস্ট নামক ছত্রাকে পাওয়া যায়, অ্যালানাইন ও থিওয়োনাইন নামক দু'টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য বাইরোজাম কে উত্তেজিত করে তোলে এবং এই ঘটনাটি ঘটে বারংবার। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হয় যে প্রোটিন সংযুক্তির জন্য ডি এন এ-এর নির্দেশের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন তাকে প্রশ্নের মুখে পড়ল। (সায়েন্স ম্যাগাজিন)

৫.❖ 'মিল্কি ওয়ে' নক্ষত্রপুঞ্জের কেন্দ্রে অবস্থিত 'স্যাজিটিরিয়াস এ নামক একটি বৃহদাকার ব্ল্যাক হোল থেকে এমন এক এক্স-রে-র খোঁজ পাওয়া গেছে যা সাধারণ এক্স-রে থেকে ৪০০ গুণ বেশি উজ্জ্বল। এটি হতে পারে দুটি কারণে– ১) ভেঙ্গে যাওয়া কোনো অ্যাস্টেরয়েডের টুকরো ওই ব্ল্যাক হোলটির মধ্যে পড়ে গেছে অথবা ২) 'স্যাজিটিরিয়াস'-এ'র পশ্চাদগামী গ্যাসের চৌম্বকক্ষেত্রে রেখাগুলি জড়িয়ে পড়ার জন্য। (নাসা)

৭.❖ নিউজিল্যান্ডের গবেষকরা মাইটোকন্ড্রিয়াল ডি. এন. এ-র বিভিন্ন কোষের মধ্যে চলাচল করার মাধ্যমে ইঁদুরের দেহে টিউমার বৃদ্ধি হতে এবং তাকে ক্যান্সারে রূপান্তর হতে দেখেছে। ক্যান্সার হওয়ার এই কারণটি এই প্রথম পর্যবেক্ষিত হল। (ম্যালাঘান ইনস্টিটিউট অফ্ মেডিক্যাল রিসার্চ)

৯.❖ ইরানের তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা কংক্রিটের ভিতরে অবস্থিত ইস্পাতের উপরে এক ন্যানোকম্পোজিট-এর স্তরের প্রয়োগের মাধ্যমে ইস্পাত তথা কংক্রিটকে আরও মজবুতি প্রদান করেন। বিভিন্ন সিভিল স্ট্রাকচার গুলি এর দ্বারা আরও দৃঢ় হতে পারে। (ন্যানোটেকনোলজি নাউ)

১৩.❖ আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সংকোচনকারী মানবপেশীকে ল্যাবরেটরীতে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে নতুন কিছু ওষুধের প্রয়োগ বা কিছু রোগ সংক্রান্ত গবেষণা যা আগে মানুষের শরীরের ভেতরে ছাড়া সম্ভব হতো না তা মানব শরীরের বাইরে করা সম্ভব হবে। (ডিউক ইউনিভার্সিটি)

২৩.❖ স্কটিশ ইউনিভার্সিটিস ফিসিক্স অ্যালায়েন্স-এর বিজ্ঞানীরা আলোর ফোটোন কণায় একটি বিশেষ ধরণের 'মাস্ক' ব্যবহারের মাধ্যমে আলোর গতিবেগ ধীর করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে এমনকি মুক্ত স্থানেও আলোর গতিবেগ কমে যায় যা এতদিন মনে করা হোতো ধ্রুবক অর্থাৎ ১৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড। (বিবিসি নিউজ)

ফেব্রুয়ারি ২০১৫

৫.❖ ইউরোপের প্ল্যাঙ্ক সায়েন্স স্যাটেলাইট-এর বিজ্ঞানীরা বিগ ব্যাং-এর পরে প্রথম নক্ষত্র সৃষ্টির সময়কাল যে **৪২ কোটি** বছর নয় **৫৬ কোটি** বছর ছিলো অর্থাৎ বিগ ব্যাং-এর পরে প্রথম নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার সময়কাল ছিলো পূর্ব ধারণার চাইতে আরও ১৪ কোটি বছর বেশি তা গবেষণার দ্বারা নির্ধারণ করেছেন। (বিবিসি)

৯.❖ হাভার্ড মেডিক্যাল স্কুল-এর বিজ্ঞানীরা জীন-প্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট ব্যাকটেরিয়া ও সৌর শক্তি দ্বারা উত্তেজিত অনুঘটকের মাধ্যমে আইসো-প্রোপানল জ্বালানীর সফলভাবে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা সালোকসংশ্লেষের সমতুল্য। (সায়েন্স ডেইলি)

১৮.❖ ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসসাউথ-এর গবেষকরা এক প্রাকৃতিক শক্তিশালী পদার্থের আবিষ্কার করেছেন। একধরনের শামুক জাতির প্রাণীর (লিম্পেট) ফসিলের দাঁতে গোয়েথাইট নামক খনিজের এমন এক নমুনা পাওয়া গেছে যা শক্তিশালী প্রকৃতিজাত পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই পদার্থের দ্বারা ভবিষ্যতে আরও দৃঢ় ও মজবুত নৌকা, গাড়ি বা উড়োজাহাজও বানানো যেতে পারে। (ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসসাউথ)

১৯.❖ ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ইঁদুরের মস্তিষ্কের উপর মানব ডি.এন.এ, এইচ.এ.আর.ই (হিউম্যান অ্যাকসিলরেটের রেগুলেটরি এনহ্যান্সার)-র প্রয়োগ দ্বারা ইঁদুরের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক-এর থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনার দ্বারা এটা প্রমাণ করেন যে এইচ. এ. আর. ই অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষের

মস্তিষ্কের আকার বড় হওয়ার জন্য দায়ী জিন। (ওয়াশিংটন পোস্ট)

২০.❖ ভারত-মায়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকায় এমন এক ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে যা ম্যালেরিয়াতে ব্যবহৃত ওষুধের কার্যকারিতাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এই ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট আগামী দিনে হাজার হাজার মানুষের জীবনের কাছে অশনি-সংকেত হিসাবে উঠে আসছে। (বিবিসি)

মার্চ ২০১৫

২.❖ নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা পত্রে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম আলোর দ্বৈত-চরিত্র অর্থাৎ তরঙ্গ ও কণা দুই চরিত্রেরই ছবি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। (নেচার পত্রিকা)

৩.❖ উল্কায় প্রাপ্ত পিরিমিডিন নামক একটি রাসায়নিক থেকে মহাকাশের এক ল্যাবরেটরিতে জীবনের প্রাথমিক জৈব যৌগ ডি.এন.এ এবং আর.এন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। (নাসা)

৬.❖ লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ হসপিটালের গবেষকরা সর্বপ্রথম স্টেম সেল দ্বারা ফুসফুসের ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে চলেছেন। এই পরীক্ষা সফল হলে ফুসফুসের ক্যান্সার নিরাময়ের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে গবেষকদের আশা। (দ্য গার্ডিয়ান)

১২.❖ নাসার হাব্‌ল স্পেশ টেলিস্কোপ দ্বারা বৃহস্পতির সর্ববৃহৎ উপগ্রহ গ্যানমেডার উপরিপৃষ্ঠের নীচে ভূ-গর্ভস্থ নোনা জলের এক সমুদ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। (নাসা)

১৯.❖ ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্রাটোসফেরিক অবজারভেটরি ফর ইনফ্রারেড অ্যাস্ট্রোনমি-র গবেষকদের মতে মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্র সুপারনোভা-র অবশেষ দ্বারা সৃষ্ট। (দ্য নিউ-ইয়র্ক টাইমস)

২২.❖ হাভার্ড বিশ্ববিদ্যায়লের গবেষকরা লুপ্ত হয়ে যাওয়া উলি ম্যামথের জিন বর্তমান যুগের হাতির ডি.এন.এ-তে সংযুক্ত করার পর দেখা যায় তা স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে। এর ফলে হয়তো বর্তমান সময়েই আমরা লুপ্ত হয়ে যাওয়া উলি ম্যামথকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবো। (দ্য টেলিগ্রাফ, ইউ.কে)

২৬.❖ ইয়েসিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অফ মেডিসিনের গবেষকরা একটি ইঁদুরের উপর ন্যানো টেকনোলজির মাধ্যমে ক্ষতস্থান নিরাময়ের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ দ্রুততর আরোগ্য পর্যবেক্ষণ করেছেন। এর ফলে ভবিষ্যতে যে কোনো ধরনের কাটা-ছেঁড়া-র ক্ষেত্রে আরও দ্রুততর নিরাময়ের আশা করা যায়। (সায়েন্স ডেইলি)

এপ্রিল ২০১৫

৫.❖ লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার দু'বছর পর তার বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উন্নততর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ করণের পর পুনরায় চালু হোলো। (বিবিসি)

৮.❖ একটি স্বল্প বয়স্ক নক্ষত্রের উপরিপৃষ্ঠে ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির গবেষকরা জটিল জৈব অনু-র সন্ধান পেয়েছেন যা আসলে প্রাণ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়। এই পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে যে পৃথিবীর বাইরেও প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিলো। (সায়েন্স ডেইলি)

১৫.❖ আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা অ্যালঝাইমার্স বা ডিমেনশিয়া কারণ হেতু মস্তিষ্কের সংক্রমণ প্রতিরোধকারী মাইক্রোগিলাকে চিহ্নিত করেছে। এই মাইক্রোগিলা আর্জিনিন নামক এক অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ভেঙ্গে দেয় যা পরবর্তীতে অ্যালঝাইসার্স বা ডিমেনশিয়া রোগের সৃষ্টি করে। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এরপর ইঁদুরের উপর একটি রাসায়নিক ব্যবহার করে মাইক্রোগিলা উৎসেচকের আর্জিনিনকে ভেঙ্গে দেওয়া আটকে দেয়। এই পরীক্ষা অ্যালঝাইমার্স বা ডিমেনশিয়া রোগের চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। (বিবিসি)

২২.❖ ইউরোপীয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরীর গবেষকরা সৌরজগতের বাইরের একটি গ্রহ থেকে আগত আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সৌরজগতের বাইরের গ্রহ থেকে আগত আলোক রশ্মির বর্ণালী বিশ্লেষণের এটাই প্রথম নমুনা। (সায়েন্স ডেইলি)

মে ২০১৫

৫.❖ ইয়েল ইউনিভার্সিটি-র গবেষকরা পৃথিবী থেকে বহু দূরে অবস্থিত এক নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পেয়েছেন। এ.জি.এস.জেড.এস.৮-১ নামক এই নক্ষত্রপুঞ্জটি ১৩শ ১০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। (দ্য নিউ-ইয়র্ক টাইমস)

১৫.❖ আমেরিকার ন্যাশানাল ওশনিক অ্যান্ড অ্যাটমস্ফিরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশান-এর গবেষকরা এই প্রথম উষ্ণ রক্তের মাছের সন্ধান পেয়েছেন। 'ওপাহ' নামক এই মাছটি গভীর সমুদ্রের মাছ হলেও নিজের শরীরকে গরম রাখতে সক্ষম। শুধু তাই নয় এরা দেহের উষ্ণতা বাড়াতে কমাতেও পারে। (বিবিসি)

২৮.❖ আমেরিকার ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়াম অফ ন্যাচার হিস্ট্রি-র গবেষকরা ইথিওপিয়ার আফার অঞ্চলে **অস্ট্রালোপিথেকাস ডেইরেমেজ** নামক প্রাচীন মানুষের একটি নতুন প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন। ওই প্রজাতির একটি কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায় যেটি ৩৩ থেকে ৩৫ লক্ষ বছরের পুরানো। (বিবিসি)

৩০.❖ স্পেন-এর মাদ্রিদের ইউনিভার্সিটারিও হাসপাতালের গবেষকরা ফুসফুসের ক্যান্সারের নিরাময়ের জন্য নিভোলুনাব নামক এক ওষুধের পরীক্ষা করেছেন যা ক্যান্সার দ্বারা আক্রান্ত কোষগুলিকে আমাদের শরীরে প্রতিরোধক ব্যবস্থার কাজ তুলে ধরে ও ক্যান্সার কোষগুলি বিনষ্ট করে। এই পরীক্ষা ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসায় আগামী দিনে সাহায্য করবে। (বিবিসি)

সংগঠন সংবাদ

দার্জিলিঙ জেলার ফাঁসীদেওয়ায় বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মসূচী এবং বিডিও'র সাক্ষাৎকার

বিডিও শ্রী বীরুপাক্ষ মিত্র

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙ জেলায় তরাই অঞ্চলের ফাঁসীদেওয়া এবং উত্তর দিনাজপুরের সোনাপুর অঞ্চলে এক 'ইলেক্ট্রিক বাবা'র আবির্ভাব হয়। এই বাবার মন্ত্রপূত জলে দূরারোগ্য সব ব্যাধি দূর হওয়া এবং মনস্কামনা পূরণের খবরে হাজার হাজার সমস্যা জর্জ্জরিত মানুষ বাবার দর্শনে যেতে থাকেন গত ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে জানুয়ারি ২০১৫ সময়কালে। চিকিৎসা বন্ধ করে ছুটতে থাকে হাজারো মানুষ। প্রণামির পাহাড় জমতে থাকে। চিকিৎসা বন্ধ করে মন্ত্রপূত জল খেয়ে কয়েকজনের মৃত্যুও ঘটে। খবর পেয়ে বিজ্ঞান মনস্ক'র উত্তরবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে ফাঁসীদেওয়া যাওয়া হয় ২১ থেকে ২৪শে ডিসেম্বর ২০১৪। ব্লক উন্নয়ন অফিসার **শ্রী বীরুপাক্ষ মিত্র'র** সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। তিনি জানান 'বাবা' এলাকায় ব্যবসা খুলেছিল, পরে প্রশাসনের চাপে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উত্তর দিনাজপুরের সোনাপুরে ঠেক গেড়েছেন। সেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে বাবার করুণা পেতে সপ্তাহে ২ দিন জমায়েত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের। গাড়ি করে দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্য থেকে মানুষ আসছেন। বাবার দর্শন যাতে মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে করতে পারেন পুলিশ-প্রশাসন সেই ব্যবস্থা নিতে তৎপর। কয়েকমাস ব্যবসা করে যদিও বাবা এলাকা থেকে পগার পার হন।

বিজ্ঞান মনস্ক'র উত্তরবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে গত ২৪শে ডিসেম্বর ফাঁসীদেওয়া ব্লক অফিসের সামনে ফাঁসীদেওয়া বাজারে পথসভা এবং অলৌকিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ও আলোচনা চালানো হয়। এনসেফালাইটিস, কালাজ্বর এবং ডেঙ্গু কি ও কেন? প্রতিকারের উপায় নিয়েও বক্তব্য রাখা হয়। অলৌকিক বাবাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। বাজারে মানুষের ভিড় হয়েছিল যথেষ্টই।

বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত এই ব্লকটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানতে ২২শে ডিসেম্বর বিডিও শ্রী বীরুপাক্ষ মিত্র'র একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপ ঃ

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ আন্তর্জাতিক সীমানা লাগোয়া এই ব্লকটির জনসংখ্যা কত?

বীরুপাক্ষ মিত্র ঃ দার্জিলিঙ জেলার ফাঁসীদেওয়া ব্লকের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে বয়ে গেছে মহানন্দা নদী। নদীর ওপারে বাংলাদেশ। বিডিও অফিস থেকে সীমান্ত মাত্র কয়েকশ ফুট। এখানকার জনসংখ্যা ২ লক্ষ ৫ হাজার ৬১৭ জন। এর মধ্যে মুসলমান ৩৭ শতাংশ এবং খ্রিস্টান ১০-১২ শতাংশ, বাকিরা হিন্দু।

বি. ম. ঃ এখান মানুষের প্রধান জীবিকা কী?

বী. মি. ঃ ব্লকের বড় অংশের মানুষ আশপাশের চা-বাগানে কাজ করেন। বাকিদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। দোকানদার, কর্মচারি, শিক্ষক ইত্যাদি মানুষ অতি অল্প।

বি. ম. ঃ ব্লকে বিপিএল-এর সংখ্যা কত?

বী. মি. ঃ ব্লকের জনসংখ্যার মধ্যে সরকারি হিসেবে বিপিএল হলেন ৪০.৮৭ শতাংশ মানুষ এবং এপিএল হলেন ৫৯.১৩ শতাংশ।

বি. ম. ঃ এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরকম?

বী. মি. ঃ আশপাশের অন্যান্য ব্লকের তুলনায় কিছুটা ভাল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ বেশি দূরে নয়। ২০১৩'র ৫ই সেপ্টেম্বর ব্লকে নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশনাল সেন্টার (পরশ) খুলেছি। এটি একটি ১০ বেডের ছোট হাসপাতাল। ভয়াবহ অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে বিনা পয়সায়। এইসব রোগীদের দিনে ৪ বার দুধ, ২ ফোঁটা নারকেল তেল, হেলথ ড্রিংক, দিনে ও রাতে খাবার দেওয়া হয়। এছাড়া পরিবারকে ৩ দিন দৈনিক ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। ব্লকে ২০১৩ সালে ভয়াবহ অপুষ্টিতে ভোগা মানুষ ছিলেন ৪৪১ জন, বর্তমানে তার সংখ্যা ৪২ জন। হেলথ সেন্টারে ডাক্তার আছে।

বি. ম. ঃ এখানে সংক্রামক অসুখ কি আছে?

বী. মি. ঃ এখানে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ তেমন আর নেই। সম্প্রতি ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা গিয়েছিল। এবছর ব্লকের ২ জন এনসেফালাইটিসে মারা গেছেন। বেশ কিছু মানুষ অসুস্থ হয়েছিলেন। শূকর পালনই প্রধান সমস্যা। আমরা ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।

বি. ম. ঃ শূকর তো এনসেফালাইটিসের পোষক। তাদের

রক্ত পরীক্ষা হয়েছিল?

বী. মি. ঃ না তেমন কিছু জানা নেই। মানুষের পরীক্ষা হয়েছে।

বি. ম. ঃ এছাড়া অন্য কোনো সংক্রমণ?

বী. মি. ঃ সংলগ্ন বিহারের মত উত্তরবঙ্গের এই ব্লকটিতে কালাজ্বরের প্রকোপ খুব বেশি।

বি. ম. ঃ কালাজ্বর?

বী. মি. ঃ হ্যাঁ, এটি একটি কালাজ্বর অ্যাফেক্টেড ব্লক। চা-বাগানগুলিই এর উৎস। এক প্রকার মাছি (স্যান্ড ফ্লাই) হল এই রোগের বাহক। যেখানে শূকর পালন হয় সেখানে মাটির ধুলোতে, মাটির বাড়ির মেঝে, ৬ ফুট পর্যন্ত উচ্চতার দেওয়াল, দরজা, জানলার ফাটলে এই মাছি ডিম পাড়ে ও বসবাস করে। চা বাগানের মধ্যে শ্রমিকদের ঘরগুলি ৪০/৫০ বছর আগে তৈরি। দেওয়াল ও মেঝে ফাটা, দরজা-জানলা ভাঙা। প্রতি ১০টি ঘরের মধ্যে ৪টিতে লোক নেই। এগুলিই এই স্যান্ড ফ্লাই-এর বংশ বিস্তারের জায়গা। বহুদিন ধরে এখানে কালাজ্বর দেখা যায় গরীব চা বাগান শ্রমিকদের পরিবারে। অনেকেই মারা গেছেন। আমরা বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ঘরগুলোর মেঝে কংক্রিট করেছি, দেওয়ালের ৪ ফুট ফ্লেক্স দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। ঘর পিছু ১৬ হাজার টাকা খরচ করেছি প্রায় ৩৫০ পরিবারে। তবু একে রোখা যাচ্ছে না। ঘরে ঘরে অপুষ্টি দূর করে বাসস্থানের উন্নয়ন দরকার।

বি. ম. ঃ শিক্ষার প্রচলন কেমন?

বী. মি. ঃ এখন শিক্ষার প্রচলন আগের থেকে অনেক বেড়েছে। সবাই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে চায়, শিক্ষিত হয়ে ভাল কাজ পাবে এই আশায়। তবে গরীব পরিবারগুলি বেশিদূর চালাতে পারে না। ছেলেরা একটু বড় হয়ে কাজে লেগে যায় আর মেয়েদের বাল্য বিবাহের চল আছে। আমার ২ বছরের সময়কালে ১২টি বাল্য বিবাহ রোধ করেছি।

বি. ম. ঃ মানুষের জীবিকার বিষয়টা বলুন।

বী. মি. ঃ এখানে ১৩টা রেজিস্টার্ড চা বাগান আছে। আরও কিছু ব্যক্তিগত বাগান আছে। একটা বড় অংশের মানুষ বাগানে কাজ করেন। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়, মজুরি কম। বাকিরা মূলত কৃষিজীবী। ধানের পাশাপাশি সবজি চাষও হয়। মহানন্দা ক্যানাল থাকায় বড় অংশের জমিতে সেচের বন্দোবস্ত আছে। নদীর লাগোয়া অঞ্চলে বর্ষার সময় ওয়াটার লগিং হয়। গত কয়েকবছর সেচ দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ওয়াটার লগিং কমাতে পেরেছি। এখানে ব্লকের উদ্যোগে বি আর জি ই আই প্রকল্পের অধীনে ফার্মার্স ক্লাব গড়েছি। ক্যানাল, সাব ক্যানাল কাজে লাগিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা গেছে। তবে চাষীদের ফসলের বাজার না পাওয়ার সমস্যার সমাধান করা যায় নি।

বি. ম. ঃ মা ও শিশুর কল্যাণের বিষয়ে ব্লক থেকে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

বী. মি. ঃ এপ্রিল থেকে নভেম্বর ২০১৪ সময়কালে ৮৫৬ জন মায়ের প্রসব হেলথ সেন্টার বা হাসপাতালে করা গেছে। এটা মোট শিশুজন্মের প্রায় ৯৪ শতাংশ। এই সময়কালে ব্লকে ৫৭টি শিশু জন্মের পর মারা গেছে। ২৫ জন উত্তর বঙ্গ মেডিকেল কলেজে, একজন জেলা হাসপাতালে এবং বাকিরা বাইরে। এই সময়কালে মায়ের গর্ভে মারা গেছে ৪টি শিশু – দুজন বাড়িতে, দুজন হাসপাতালে। আমাদের ব্লকে ৭টা সরকারি অ্যাম্বুলেন্স আছে। পাবলিক হেলথ সেন্টার আছে।

বি. ম. ঃ এখানে সাপে কেটে মারা যাওয়া রোগী দেখা যায়?

বী. মি. ঃ এই ব্লকে এমন ঘটনা প্রচুর ঘটে। গরম ও বর্ষার সময় এটা বেশি দেখা যায়। অ্যান্টিভেনমের ব্যবস্থা বি পি ডবলু সি এবং পি এইচ সি হাসপাতালে আছে। আমরা রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠাবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করি।

বি. ম. ঃ যারা সাপে কেটে মারা যান তাদের ক্ষতিপূরণ মেলে?

বী. মি. ঃ অতীতে সরকার সাপে কেটে মারা গেলে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিত। বর্তমান রাজ্য সরকার এই প্রকল্প বাতিল করেছে। অতীতে অনেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। বর্তমানে সমস্যা হচ্ছে। কিছুদিন আগে একটি দুস্থ পরিবারের একজন সাপে কেটে মারা যায়। ওনার স্ত্রীর কেউ নেই। সরকারি ক্ষতিপূরণ বন্ধ হওয়ায় আমরা অন্যভাবে কিছু করার চেষ্টা করেছি।

বি. ম. ঃ কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা বা বাধা পেয়ে থাকেন কী?

বী. মি. ঃ উপর মহলের সমস্যা ... এই চেয়ারে বসে এ বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু বলতে পারব না। অনুমান করে নিন। তবে ব্লকে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি ক্ষমতা অনুসারে। মানুষ আমায় ভালবাসে, মেনে নেয়।

বি. ম. ঃ এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি এতটা সময় দিলেন, ধন্যবাদ। আমরা আপনার অনুমতি নিয়ে আগামী ২৪শে ডিসেম্বর কুসংস্কার বিরোধী সভা, ভণ্ডবাবার স্বরূপ উন্মোচন করতে চাই।

বী. মি. ঃ অবশ্যই করবেন। আমি অনুমতি দেব। আপনারা এগিয়ে আসুন। আর কুসংস্কার টিকে থাকে সামাজিক ব্যবস্থার কারণে।

বি. ম. ঃ ঠিক বলেছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ■

সংগঠন সংবাদ

২০১৫'র বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন

গত ১লা ও ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ যথাক্রমে সোনারপুরে বৈকুণ্ঠপুর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ঠাকুরপুকুরের স্বভূমি কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় 'বিজ্ঞান মনস্ক'র বার্ষিক অনুষ্ঠান। দুটি অনুষ্ঠানকেই সাজানো হয়েছিল একই রকম অনুষ্ঠান সূচীতে।

অনুষ্ঠান সূচী ছিল নিম্নরূপ ঃ– (১) উদ্বোধনী সংগীত (২) সংগঠনের পক্ষ হতে দু-চার কথা (৩) স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল উপস্থাপনা (৪) পাঠকদের মতামত (সমীক্ষণ সম্বন্ধে) (৫) ১০২ তম বিজ্ঞান কংগ্রেসের আলোচনা কতটা বিজ্ঞান সম্মত – বিতর্কমূলক আলোচনা (৬) সেমিনার, ধর্ম-বিজ্ঞান ও সমাজ (৭) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সংগঠনের সদস্যদের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে নন্দা মুখার্জী সংগঠন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কথা বলেন। সংগঠনের সাফল্য, ব্যর্থতার দিক তুলে ধরে উপস্থিত দর্শকদের সংগঠনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হবার আহ্বান রাখেন।

এরপর স্থানীয় স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের দ্বারা বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল প্রদর্শনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্থানীয় বিদ্যালয় বা ক্লাব অংশগ্রহণ না করলেও কয়েকটি বিদ্যালয়, ক্লাব ও উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশ গ্রহণ করে।

সোনারপুরের অনুষ্ঠান ঃ– প্রথমে জোতির্ময় পাবলিক স্কুলের ছাত্র অনুভব শীল 'জরুরী যানবাহনের জন্য ট্যাফিক সিগনাল' এর মডেল প্রদর্শন করে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী সমেত অ্যাম্বুলেন্স ট্রাফিক সিগনালে আটকে যায়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ট্রাফিক সিগনালের কিছু আগে একটি স্বয়ংক্রিয় ডিটেকটর বসানোর কথা বলা হয় যাতে কোন অ্যাম্বুলেন্স ট্রাফিক সিগনালে আটকে গেলে আম্বুলেন্সে লাগানো যন্ত্র ট্রাফিক কনট্রোলে জানা যাবে ও ট্রাফিক সিগনাল সবুজ হয়ে যাবে।

এরপর ঘাষিয়াড়া বিদ্যাপীঠের ছাত্র সুমন মন্ডল বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক প্রশান্তবাবুর তত্ত্বাবধানে 'জল নির্দেশক' মডেল উপস্থাপন করে। তাতে দেখানো হয় একটি জল সেন্সর যা জলের উপস্থিতিতে বেজে ওঠে। জল লাগলে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। এই ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রয়োগের কথাও বলা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে এক উৎসাহী ছাত্র অহীন্দ্র মান্না 'শঙ্কু আকৃতির বেলনের অভিকর্ষের বিপরীতে উপরে ওঠা' মডেলের মাধ্যমে দেখায়, কোন বস্তুর ভরকেন্দ্রের অবস্থান বস্তুর আকৃতির উপর নির্ভর করে। বেলনের বিশেষ আকৃতি এবং সেটা যার উপর রাখা হয়েছিল তার আকৃতির জন্য ভরকেন্দ্র অনুসারে বেলন উপরে উঠছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের খুব ভালো লেগেছিল।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'গ্রীন কর্ণার' থেকে আগত ছাত্র নেপাল পাত্র ও ছাত্রী প্রিয়া মাহাতো তাদের শিক্ষক অনুরাগ বিশ্বাস মহাশয় ল্যাপটপ ও প্রোজেক্টের দ্বারা এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মান্ডে আমরা যে অতিক্ষুদ্রতম তা খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন। আমরা অবাক চোখে দেখি আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের বিপুলতা।

ঠাকুরপুকুরের অনুষ্ঠান ঃ– প্রথমে স্থানীয় বিদ্যালয়ের এক ছাত্র সৌভিক সেন 'মাটির আদ্রতা নির্দেশক যন্ত্রের' মডেল সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করে। চাষের জমির মাটিতে জলের আদ্রতা এই স্বয়ংক্রিয় আদ্রতা নির্দেশক যন্ত্র যেমন টের পাবে সেই অনুযায়ী জমিতে জলসেচ করবে। জলের অপচয় হবে না এবং ফসল ও ভালো হবে, উপস্থিত সবাই এই মডেলের উপস্থাপনের প্রশংসা করেন। এর কৃষিকার্যে প্রয়োগের গুরুত্ব আছে।

এরপর উদয়রামপুর পল্লীশ্রী বিদ্যায়াতনের ছাত্ররা তাদের বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক অভিজিত মজুমদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও প্রধান শিক্ষক উৎপল মন্ডল মহাশয়ের উপস্থিতিতে অনিরেক মন্ডল, সুমন দাস, সার্থক মাঝি, সৌমিত্র নস্কর, অলোকদীপ দাস দুটি প্রকল্প উপস্থাপন করে। প্রথমে বিভিন্ন ধরনের পিঁপড়ের আচরণ প্রোজেক্টরের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ছাত্ররা নিজেরা তাদের শিক্ষকের সঙ্গে বিভিন্ন বাগানে, মাঠে ছবি তুলে সেগুলি বিশ্লেষণ করে এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করেছে। দ্বিতীয় প্রোজেক্টটি ক্যান্সার ও এইডস-এর উপর ছিল যার উপস্থাপন সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

শেষ পর্যায়ে স্থানীয় মাতঙ্গিনী পাড়া থেকে ৪জন ছাত্র-ছাত্রী সুদীপ পাত্র, উৎসব শীল, প্রিয়াঙ্কা শীল, মৌমিতা মুখার্জী মদ্যপানের ক্ষতিকর দিকগুলি মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপন করে এবং বিভিন্ন মশার জীবনচক্র চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। সবশেষে গ্রীন কর্ণারের ছাত্র সাগর পাত্র ও ছাত্রী বাতাসী প্রামাণিক

মহাকাশযান ভয়েজার-২ এর মডেল প্রদর্শন করে ও তার কার্যকারিতা বর্ণনা করে।

এরপর সংগঠনের মুখপত্র 'সমীক্ষণ' এর পাঠকদের বক্তব্য রাখার জন্য ইচ্ছুক পাঠকদের আহ্বান করা হয়। সোনারপুরের অনুষ্ঠানে চারজন পাঠক পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। প্রথম বক্তা প্রগতিশীল যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র-র প্রতিনিধি শ্রী সুকান্ত হালদার বলেন যে সমীক্ষণের রচনা তাঁকে সমৃদ্ধ করে। সমালোচনা করার কিছু নেই। দ্বিতীয় বক্তা ডঃ ননীভূষণ ফৌজদার বলেন সমাজের বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব সর্বত্র। গণেশ মূর্তিকে দুধ খাওয়ানোর ঘটনাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই গণেশকে দুধ খাওয়াতে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র এদেশে নয় পৃথিবীর সর্বত্রই এই ঘটনা ঘটেছে। এটাই বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব। তিনি বলেন শুধুমাত্র পত্রিকাতে লিখলে এটা কাটবে না বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি করে মানুষকে বোঝাতে হবে। এই প্রসঙ্গে সমীক্ষণের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তৃতীয় বক্তা শ্রী তপন সান্যাল বলেন তিনি সমীক্ষণের নিয়মিত পাঠক। পত্রিকার বিভিন্ন লেখা তাঁকে মুগ্ধ করে। স্বল্প মূল্যে এমন পরিপাটি ও প্রায় মুদ্রণ প্রমাদহীন পত্রিকা খুবই বিরল। পত্রিকায় সাক্ষাৎকারগুলি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়। পত্রিকাটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তিনি কতকগুলি প্রস্তাব দেন সেগুলি হল কুসংস্কার বিরোধী রচনা নিয়মিত করা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা একটি কলাম রাখা যেখানে মনীষীদের ছবি সহ আত্মজীবনী, মঙ্গলযান সম্বন্ধে লেখা, দেশে বিভিন্ন জায়গায় যে বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে তার বিবরণ ইত্যাদি যুক্ত করা। সর্বশেষে তিনি সমীক্ষণের সাফল্য কামনা করেন। চতুর্থ বক্তা পার্থসারথি দত্ত বলেন তিনি সম্প্রতি সমীক্ষণের সংস্পর্শে এসেছেন। তিনি বলেন কলা বিভাগের ছাত্র হলেও বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর অনেক ভুল ধারণা এই পত্রিকা পড়ে ভেঙ্গে গেছে। জীব বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা যেমন পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব সংক্রান্ত লেখাটি তাঁর বিশেষ ভাবে মনে দাগ কেটেছে কিন্তু রচনার সূত্রগুলি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকলে তা আরও ভাল হত। পত্রিকাটির মূল্য সামান্য, এর প্রচার ও প্রসার একান্ত কাম্য। কুসংস্কার থেকে মুক্তির উপায় কি তা বিশদভাবে থাকলে উপকৃত হবেন।

ঠাকুরপুকুরের অনুষ্ঠানে তিনজন পাঠক তাদের সুচিন্তিত মতামত জানান ঃ– প্রথম বক্তা কৌশিক হালদার বলেন পত্রিকার সাথে তার এক বছরের পরিচয়। তিনি বলেন পত্রিকার লেখার মান সাধারণের গ্রহণযোগ্যতার অনেক উর্দ্ধে। সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা দরকার। সংগঠনের প্রসার ঘটলে তবেই পত্রিকার প্রসার ঘটবে। সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাজিত করতে হলে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার অত্যন্ত আবশ্যক। এর পরবর্তী পাঠক প্রফেসর সুমিত মুখার্জী বলেন তিনি সমীক্ষণের বিশ্বউষ্ণায়নের সংখ্যাটি প্রথম হাতে পান তাঁর নাতনীর মাধ্যমে। তিনি বলেন বিজ্ঞান মনস্ক হতে গেলে যে বিজ্ঞানের ছাত্র হতে হবে এ ধারণা ভ্রান্ত। কলা বিভাগের ছাত্র হলেও বিজ্ঞান মনস্ক হতে কোনো বাধা নেই। তিনি বলেন সমাজ বিপ্লবে বিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি শিল্পবিপ্লবে বিজ্ঞানের ভূমিকা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন Fundamental Science -এর উপর জোর দিতে হবে। কুসংস্কারের কারণ খুঁজতে হবে। শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে হবে ও grading system আনতে হবে। সর্বশেষে তিনি সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। এর পরবর্তী বক্তা হিসাবে অখিল ভারত প্রগতিশীল ছাত্র মঞ্চের প্রতিনিধি বলেন সমীক্ষণ ছাত্রদের সমৃদ্ধ করে। সমীক্ষণের মাধ্যমেই জানতে পেরেছেন যে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ মনুষ্যজনিত এই প্রচারের পিছনে একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে। সমীক্ষণ পাঠ করে জানা গেছে যে ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক ঘটনা এবং তার পূর্বাভাস সম্ভব। তিনি বলেন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সুফলগুলি একটিমাত্র শ্রেণী ভোগ করছে। পত্রিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি কয়েকটি পরামর্শ দেন যেমন পত্রিকার প্রথমদিকের সংখ্যাগুলিতে বিজ্ঞানীদের জীবনী থাকত কিন্তু বর্তমানে তেমন থাকছে না। এটি চালু করা দরকার, ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট কলম থাকা দরকার। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচী নিয়ে রচনা থাকা দরকার। সবশেষে পাঠক শংকর কর বলেন এআইপিএসএফ-এর বক্তার সঙ্গে তিনি একমত। বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের জন্য অনেক বিজ্ঞানী প্রাণ দিয়েছেন।

এরপর শুরু হয় বিতর্কমূলক আলোচনা সভা। বিষয় ছিল '১০২ তম ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের আলোচনা কতটা বিজ্ঞান সম্মত'। এই পর্বে সোনারপুরের অনুষ্ঠানে তিনজন ও ঠাকুরপুকুরের অনুষ্ঠানে দুইজন বক্তা বক্তব্য রাখেন। সোনারপুরের অনুষ্ঠানে প্রথম বক্তা শ্রী অনুরাগ বিশ্বাস বলেন গত বিজ্ঞান কংগ্রেসে একটি মাত্র আলোচনা প্রধান বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে তাহল বৈদিক যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতি। তাতে যা বলা হয়েছে তাকে Pseudo science বা মেকীবিজ্ঞান বলা যায়। সরকারের বিশিষ্ট মন্ত্রী আমলাদের উপস্থিতিতে বিষয়টি চর্চা হয়। বলা হয় বৈদিক যুগের বিজ্ঞান বর্তমান বিজ্ঞানের

থেকে অনেক উন্নত ছিল কিন্তু এর পক্ষে কোন তথ্য প্রমাণ পেশ করা হয় নি। উনি বলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের ঐ সেশনের আলোচনাটি বিজ্ঞানসম্মত তো নয়ই বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। পরবর্তী বক্তা ছিলেন নেহাই উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও 'জাকারি' সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিজ্ঞানকর্মী শ্রী স্বপন চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের সত্যিকারের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন বিজ্ঞান কংগ্রেস কথাটার অর্থ হল বিজ্ঞানভিত্তিক একটি মঞ্চ যেখানে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ছাত্র শিক্ষক বিজ্ঞানকর্মী এসে বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চা করবেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণাপত্র পাঠ করা হবে ও তার উপর আলোচনা হবে। ১৯১৪ সাল থেকে এই কংগ্রেসের জন্মকাল হতে এমনটা চলছিল বর্তমানে এর মান নিম্নমুখী হয়েছে যখন দেখা যায় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে বলা হচ্ছে 'largest fair of the scientist'। এটা কোন মেলা নয়। অতীতের শল্যচিকিৎসা, অতীতের স্থাপত্য, অতীতের প্রযুক্তিকে খুব বড় করে দেখিয়ে মহিমান্বিত করা হচ্ছে। আসলে এটা হিন্দুত্ববাদকে মহিমান্বিত করে তাকে জোর করে টিকিয়ে রাখার কৌশল। পরবর্তী বক্তা ডঃ ননীভূষণ ফৌজদার বলেন ঐ সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তবে এটা ঠিক যে কোন সম্মেলনে যদি খারাপ কিছু চর্চা হয় তবে সেটা বেশি করে আলোচনাতে এসেছে। সম্মেলনের অনেক ভাল দিক রয়েছে। কোন গবেষণাকেন্দ্রে কি গবেষনা হচ্ছে সে বিষয়ে মতের আদান প্রদানের একটি মঞ্চ হল বিজ্ঞান কংগ্রেস। অতীতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের আলোচনায় মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছে তার অনেক নিদর্শন রয়েছে।

ঠাকুরপুকুরের অনুষ্ঠানে দুইজন বক্তার মধ্যে প্রথম শ্রী পার্থসারথী মুখার্জী বলেন বিষয়টি বিতর্কমূলক নয় বরং বলা উচিত উস্কানিমূলক। ১০২ তম বিজ্ঞান কংগ্রেস-এর আলোচনা বিষয় গত ১০১ বছরে আসেনি। এবারের কংগ্রেসের প্রধান উদ্যোক্তা যেহেতু ছিল বম্বে ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত বিভাগ তাই বৈদিক যুগের বিজ্ঞান চর্চার বিষয়টি প্রধানভাবে উঠে এসেছে। এটা বর্তমান কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়। বিজেপি এটা আগেও করেছে। বৈমানিক শাস্ত্রের বিকাশ ১৯০৯ সালের পূর্বে কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। শ্রী মুখার্জী আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে এমন ঘটনা ভবিষ্যতে বার বার ঘটবে। কারণ বিষয়টি উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং রাজনৈতিক। যেহেতু বিষয়টি রাজনৈতিক তাই তার মোকাবিলা রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে। দ্বিতীয় ও শেষ বক্তা নেহাই সংগঠনের প্রতিনিধি অরিন্দম মজুমদার বলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মান ক্রমশঃ নীচে নেমে যাচ্ছে এবং সংগঠনটিতে এলিট শ্রেণীর বিজ্ঞানীরাই ক্ষমতাবান। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সাধারণত তাদের গবেষণাপত্র কোন দেশীয় জার্নালে না পাঠিয়ে তা বিদেশী জার্নালে পাঠান।

এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টির উপর সংগঠনের বক্তব্য পেশ করা হয়। সমস্ত বক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে এবং তাঁদের বক্তব্যের গুরুত্বকে উল্লেখ করে বলা হয় এই বিষয়টিকে বিচ্ছিন্নভাবে বা কয়েকজন নেতামন্ত্রীদের আবেগ হিসাবে না দেখে বরং এর পিছনের চক্রান্তটিকে তুলে ধরা হয়। বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরীখে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার আহ্বান রাখা হয়। সমাজে অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে প্রোথিত করার লক্ষ্যেই সমাজ পরিচালকরা বিজ্ঞান কংগ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চটি নির্বাচন করে। বক্তব্যে বলা হয় বিষয়টি যে একতরফা হয়েছে এমন নয়। পৃথিবীব্যাপী বহু বিজ্ঞানী বিজ্ঞান কংগ্রেসের ঐ সেশনটি বাতিল করার জন্য পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন ও ফেসবুক, টুইটারে তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সমস্ত বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের উচিত এর প্রতিবাদ করা। উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীকেও প্রতিবাদে সামিল হবার আহ্বান জানানো হয়।

এরপর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা বিষয় **'ধর্ম, সমাজ ও বিজ্ঞান'**। সংগঠনের চার জন্য সদস্য এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা ধর্মের উৎপত্তি, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উত্থান সমাজ বিকাশের সাথে ধর্মের ক্রমবিবর্তন কিভাবে হয়েছে। কিভাবে মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলেও কিভাবে তা বলপূর্বক টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্ঠা জারী রয়েছে তা বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই বিষয়টির উপর একটি সম্পূর্ণ রচনা পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত করা হবে। এরপর কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন গান, কবিতা, নৃত্য, শ্রুতি নাটক ইত্যাদি উপস্থাপনা করা হয়।■

বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক

গত শীতের মরশুম থেকে ২০১৫ সালে মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত জেলা, শহর বা মহকুমা বইমেলায় অন্যান্যবারের মত বিজ্ঞান মনস্ক তার মুখপত্র সমীক্ষণ নিয়ে হাজির থাকার চেষ্ঠা করেছে সাধ্যমত। বহু মানুষ আমাদের পত্রিকা নিয়েছেন, তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, বিভিন্ন প্রশ্নে আমাদের সাথে বিতর্ক করেছেন, পত্রিকার প্রশংসা এবং সমালোচনা রেখেছেন। যে যে জেলাগুলিতে আমরা হাজির ছিলাম তা নিম্নরূপ ঃ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ সুন্দরবনের রাক্ষসখালি এবং

সোনারপুর বইমেলা।

কলকাতা ঃ গড়িয়ার নিকটস্থ পাটুলি, কলেজ স্কোয়ারের লিটল ম্যাগাজিন মেলা, বেহালার হরিসভা মাঠ এবং ব্লাইন্ড স্কুলে অনুষ্ঠিত মেলা।

বর্ধমান ঃ দুর্গাপুর এবং আসানসোল বইমেলা।

মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুর বইমেলা।

দার্জিলিং ঃ শিলিগুড়ি বইমেলা।

এছাড়া প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে যে লিটল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাতে আমরা নিয়মিত উপস্থিত থাকি।

মে-দিবসে বিজ্ঞান মনস্ক

অন্যান্য বারের মত এবারও বিজ্ঞান মনস্ক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে লাল ঝান্ডা মজদুর ইউনিয়ন (সমন্বয় সমিতি)র ডাকা অনুষ্ঠানে হাজির থেকে তার মতামত ব্যক্ত করে। কলকাতার থিওসফিকাল সোসাইটি হলে ১লা মে ২০১৫ এই অনুষ্ঠান হয়।

ছাত্র সম্মেলনে বিজ্ঞান মনস্ক

অখিল ভারত প্রগতিশীল ছাত্রমঞ্চ (এ আই পি এস এফ)'র ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে গত ২৬শে মে ২০১৫ কলকাতার ভারত সভা হলে উপস্থিত থেকে সংগঠন তার বক্তব্য তুলে ধরে। জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে, ছাত্র তথা মেহনতী ও প্রগতিশীল জনতার আন্দোলনের অভিমুখ সম্পর্কে এবং শিক্ষাক্রমে অপবিজ্ঞানের প্রচারের বিরুদ্ধে উক্ত ছাত্র সংগঠনের বিশ্লেষণ ও অভিমতের সাথে বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিনিধি সহমত পোষণ করেন এবং বিভিন্ন ইস্যুতে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার করে। ■

২০১৫'র বার্ষিক অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মডেল প্রদর্শনী

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

ইউরোপের বিজ্ঞানীরা কাজ এবং গবেষণাক্ষেত্রে ফান্ডিংয়ের সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে

সমগ্র ইউরোপ জুড়ে গবেষণাক্ষেত্রে ফান্ডিংয়ের সংকট এবং কাজের অভাবের জন্য বিজ্ঞানীরা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন। ইউরোপের ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইউকে, জার্মানি, ইটালি, গ্রীস, স্পেন প্রভৃতি দেশের শত শত বিজ্ঞানী স্ব স্ব রাষ্ট্রের কাছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতি নির্ধারকদের কাছে তাদের দাবি তুলে ধরছেন। গত ১৭ই অক্টোবর ২০১৪ ইউরোপের এইসব দেশগুলির প্রায় ১২ হাজার বিজ্ঞানী একটি অনলাইন প্রতিবাদপত্রে সাক্ষর করেছেন। বিজ্ঞানীদের অভিযোগ শিল্প উৎপাদন জারি রাখার প্রয়োজনে যতটুকু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ প্রয়োজন সেটুকু ক্ষেত্র ছাড়া মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রই বিনিয়োগ হ্রাস করে চলেছে। ধীরে ধীরে মৌলিক গবেষণায় বিনিয়োগ কমে আসায়, এই গবেষণাগুলি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে; এই ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ প্রতিদিন কমছে। এক চরম আর্থিক মন্দা ইউরোপের অর্থনীতিকে বাস্তবত গ্রাস করে নেওয়ায় রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের ক্ষেত্রে বাজেটে বড়রকমের ছাঁটাই করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলি। শুধু ইউরোপ নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্র এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও অবস্থা কমবেশি এক। ১৭ই অক্টোবর ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইউকে, জার্মানি, ইটালি, গ্রীস প্রভৃতি দেশের ১২০০০ বিজ্ঞানী এক খোলা চিঠিতে নীতিনির্ধারকদের কাছে গবেষণাক্ষেত্রে বরাদ্দ কমানোর বিরোধিতা করেছেন।

এই খোলা চিঠির প্রকাশের প্রেক্ষিতে ফ্রান্সের তিন সহস্রাধিক বিজ্ঞানী ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে 'মার্চ ফর সায়েন্স' বা 'বিজ্ঞানের জন্য যাত্রা' শুরু করে। সাইকেল চালিয়ে এবং পদযাত্রা করে সারা দেশ ঘুরে গত ১৭ই অক্টোবর ২০১৪ তারা প্যারিসে জমায়েত হন (চিত্র)। ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির সামনে জড়ো হয়ে তারা দাবি করেন একদশকের জন্য গবেষণাক্ষেত্রে ৮ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) ডলার বিনিয়োগ করতে হবে ৩ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং সহযোগী কর্মীদের জন্য এবং গবেষণার প্রয়োজনে এই সময়ের জন্য ১৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হবে।

মাদ্রিদ, রোম এবং এথেন্সের বিজ্ঞানীরাও অনুরূপ দাবিতে একই দিনে স্ব স্ব শহরে প্রতিবাদ মিছিল করেছেন। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২,
কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com